উপনিষদের গল্প

অভীক রায়

মডেল পাবলিশিং হাউস

৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩

উপনিষদের গল্প

অভীক রায়

মডেল পাবলিশিং হাউস

৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৯১, প্রকাশক ঃ জয়দেব ঘোষ, মডেল পাবলিশিং হাউস, মুদ্রক ঃ অশোক কুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র।

উপনিষদের গল্প

অভীক রায়

গুরু-শিষ্য সংবাদ

শিষ্য—কার ইচ্ছে অনুসারে নিয়োজিত হয়ে মন কাজে প্রবৃত্ত হয়? কে এই মনের নিয়ামক? কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে মুখ্য প্রাণ নিজের কাজে মনোযোগী হয়? কার ইচ্ছে অনুযায়ী আমরা কথা বলি? কোন জ্যোতিষ্মান্ চোখ এবং কানকে নিয়োগ করে?

গুরু—তিনি। তিনিই সমস্ত কিছুর মূলে। দ্রষ্টা তিনি, শ্রোতাও তিনি। কথা তিনি বলেন। সেই একই চৈতন্য সর্বত্র। তিনি ব্রহ্ম। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বময় কর্তা। ব্রহ্ম কিরকম, আমি জানি না। সেখানে নয়ন পৌঁছোয় না, কথা পৌঁছোয় না, মন পৌঁছোয় না। জ্ঞাত সমস্ত কিছু থেকে তিনি পৃথক্, আবার অজ্ঞাত সমস্ত কিছু থেকে তিনি পৃথক্। বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে তিনি উচ্চারিত হন না। অথচ শব্দ এবং বাগিন্দ্রিয় তাঁরই দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জান। মনের সাহায্যে লোকে তাঁকে চিন্তা করতে পারে না। অথচ মন তাঁরই দ্বারা উদ্ভাসিত হয়। তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জান।

নয়নের দ্বারা কেউ তাঁকে ছাখে না, অথচ নয়ন তাঁরই দ্বারা উদ্ভাসিত। শ্রবণের দ্বারা কেউ তাঁকে শোনে না, অথচ শ্রবণ তাঁরই দ্বারা প্রকাশিত। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা কেউ তাঁকে আঘ্রাণ করতে পারে না অথচ ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁরই দ্বারা প্রকাশিত। তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জান। আত্মা হতে তিনি ভিন্ন নন। যদি তুমি মনে কর 'আমি ব্রহ্মকে জেনেছি'—তবুও এখনো তিনি তোমার কাছে বিচার্য।

শিষ্য এবার যথোচিত বিচার করে বললেন, মনে হচ্ছে ব্রহ্মকে আমি জেনেছি। তবুও ব্রহ্মকে আমি ভালভাবে জেনেছি, একথা আমি মনে করি না। আবার জানি না তাও মনে করি না। আমাদের মধ্যে যিনি এই কথাটির মর্ম উপলব্ধি করেছেন তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। তাঁরই কাছে তিনি বিদিত। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী, ব্রহ্মকে তাঁরা জ্ঞাত বলে মনে করেন না, কিন্তু যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী নন ব্রহ্মকে তাঁরা জ্ঞাত মনে করেন। এই জীবনে যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তবে পরমার্থ প্রাপ্তি ঘটে।

দেবাসুর সংগ্রামে জগৎ পালনের জন্য অসুরদের পরাজিত করে ব্রহ্ম সেই জয় ও তার ফল দেবতাদের অর্পণ করলেন। ব্রহ্ম দেবতাদেরও দেবতা। তিনি দেবগণের জয়হেতু, আবার অসুরদের পরাজয়হেতু।

ব্রহ্মের বিজয় কারণে দেবতারা হলেন মহিমান্বিত, হলেন গর্বিত।

মনে করলেন, এই বিজয় আমাদের। জয়ী আমরাই হয়েছি। জয়ের সকল মহিমা আমাদের নিজস্ব।

দেবতাদের এই অহেতুক দম্ভ বুঝতে ব্রহ্মের দেরী হলো না। তাঁদেরই কল্যাণের জন্য নিজেকে তিনি দেবতাদের সামনে প্রকাশিত করলেন। তবে যক্ষের ছদ্মবেশে। কে এই যক্ষ ? কে এই পূজ্যস্বরূপ ? চিনতে না পেরে খুবই সংশয়ে পড়লেন দেবতারা। পূজনীয় আকৃতি অথচ একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। নিদারুণ সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা অগ্নিদেবকে বললেন, তুমি ওঁর

পরিচয় জেনে এসো ।

অগ্নি সেই যক্ষের কাছে গেলেন। যক্ষ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ?

অগ্নি উত্তর দিলেন, আমি অগ্নি নামে বিখ্যাত। সমস্ত হব্য গ্রহণের জন্য আমি সকল দেবতার অগ্রে গমন করি, তাই আমি অগ্নি। আবার আমার থেকেই বেদের জন্ম, তাই আমি জাতবেদা।

যক্ষ বললেন, আচ্ছা বেশ, কিন্তু কি তোমার ক্ষমতা ?

—পৃথিবীর সমস্ত কিছু আমি দগ্ধ করতে পারি।

—তাই নাকি ? এই তৃণটিকে দগ্ধ করো দেখি।

যক্ষের স্থাপন করা তৃণটির দিকে তাকিয়ে অগ্নি তাচ্ছিল্যভরে হাসলেন। হাসিমুখে বললেন, তুমি এই তৃণটিকে দগ্ধ করো।

—এক্ষুনি করছি।

কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়েও অগ্নি সেই সামান্য তৃণটিকে বিন্দুমাত্র দগ্ধ করতে পারলেন না। বরং নিজেই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হলেন। মাথা হেঁট করে ফিরে এলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। ইনি কে, আমি জানতে পারলাম না।

দেবতারা তখন বায়ুকেই বললেন, তুমি গিয়ে জেনে এসো, ইনি কে।

বায়ু গেলেন সেখানে। যক্ষ তাঁকেই জিগ্যেস করলেন—তুমি কে ?

—আমি বায়ু নামেই বিখ্যাত। আবার মাতরিশ্বা নামেও

ইন্দ্র স্বয়ং যক্ষের নিকট উপস্থিত হলেন।

প্রসিদ্ধ।

—বেশ। কিন্তু কি তোমার ক্ষমতা?

—পৃথিবীর সমস্ত কিছু আমি গ্রহণ করতে পারি।
—ভাল কথা। এটা গ্রহণ কর দেখি।
—এক্ষুনি করছি। তুমুল উৎসাহে বায়ু সেই তৃণটিকে গ্রহণ করার জন্য ধাবিত হলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। মন খারাপ করে তিনি দেবতার কাছে ফিরে এলেন।

এবার দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং রওনা হলেন যক্ষের পরিচয় জানার জন্য। কিন্তু যক্ষ তাঁর সামনে থেকে অদৃশ্য হলেন। অগ্নি বা বায়ুর মতো ইন্দ্র কিন্তু ফিরে এলেন না। তিনি সেখানেই ধ্যানমগ্ন হলেন। যক্ষের পরিচয় জানার জন্য তাঁর একাগ্রতা দেখে, ভক্তি দেখে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁকে উমারূপে দর্শন দিলেন। ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলুন, কে এই পূজনীয় পুরুষ? আমরা কেউ তাঁকে চিনতে পারি নি। উমা বললেন, ইনিই ব্রহ্মা। দেবাসুর যুদ্ধে ইনিই বিজয়ী হয়ে তোমাদের সেই বিজয় ও তার ফল দান করেছেন। অথচ তোমরা নিজেদের মহিমান্বিত মনে করছ। যেহেতু বেদবাক্য ও গুরুবাক্য পেয়ে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, উমার কথা থেকে ইন্দ্র জানলেন, ইনি ব্রহ্মা।

অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র অন্য দেবতাদের চাইতে বেশি উৎকর্ষ লাভ করেছেন। কেননা ব্রহ্মের পরিচয় জানার জন্য এঁরাই অগ্রণী হয়েছিলেন। ব্রহ্মের সঙ্গে এঁদের কথাবার্তা হয়েছিল। এই তিনজনের মধ্যে ইন্দ্রের গুরুত্ব সবচাইতে বেশি। কেননা তিনিই প্রথম এঁকে ব্রহ্মা বলে জেনেছিলেন।

নচিকেতা

বাজশ্রবার পুত্র উদ্দালক বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে তার ফল কামনায় নিজের সমস্ত কিছু দান করেছিলেন। নচিকেতা নামে তাঁর একটি পুত্র ছিল। যজ্ঞের ফল কামনায় পিতা সর্বস্ব দান করেছেন দেখে নচিকতা চিন্তা করলেন, পিতার সর্বস্বের তালিকায় তো আমিও পড়ি। তার দান সামগ্রীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হব না কেন-?

এসব চিন্তা করে, উদ্দালককে তিনি জিগ্যেস করলেন, আপনি আমাকে কার হাতে দান করবেন ?

প্রথমে পিতা কোন উত্তর দিলেন না।

নচিকেতা আবার জিগ্যেস করলেন, বলুন পিতা কার হাতে আমাকে দান করবেন ?

উদ্দালকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তোমাকে যক্ষের হাতে দান করব।

নচিকেতা তখন ভাবলেন, অনেকের মধ্যে আমি অগ্রণী হয়ে থাকি। আবার অনেকের মধ্যে আমি

মধ্যম হয়ে থাকি। কিন্তু অধম কখনো হই না। এ যেন উপযুক্ত পুত্রকে বিনা প্রয়োজনে পিতা যমের বাড়ি পাঠাতে পারেন না। কিন্তু কি সেই প্রয়োজন? যমের এখন কি প্রয়োজন আজ পিতা আমার দ্বারা সাধন করতে চাইছেন?

উদ্দালক কিন্তু সত্যি সত্যি পুত্রকে যমালয়ে পাঠাতে চান নি। নেহাত কথার কথা বলেছিলেন। কিন্তু নচিকেতা মনে করলেন তিনি যমালয়ে না গেলে পিতা সত্যভ্রষ্ট হবেন।

এই ভেবে তিনি উদ্দালককে বললেন, পিতা, মানুষ শস্যের মতো জীর্ণ হয়ে মারা যায় এবং শস্যের মতো বারে বারে জন্মায়। পিতৃ-পিতামহের সত্যনিষ্ঠার কথা আপনি বিস্মৃত হতে পারেন না। অতএব সত্যরক্ষার জন্য আমাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিন।

নচিকেতা যমালয়ে চলে এলেন। যম তখন গৃহে ছিলেন না। প্রবাসে গিয়েছিলেন। নচিকেতা আমার

তিনদিন বাদে যমরাজ প্রবাস থেকে ফিরলেন। তিনি ফেরার পর বাড়ির আত্মীয়েরা তাঁকে নচিকেতার কথা জানিয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ অতিথি অগ্নিরূপে গৃহে প্রবেশ করেন। আপনি প্রথমে তাঁর পা ধোওয়াবার জল নিয়ে আসুন।

এই তিনদিন নচিকেতা অতিথি হয়েও উপবাসে কাটিয়েছেন। যাঁর গৃহে অতিথি উপবাসে থাকেন, সেই অল্পবুদ্ধি মানুষের সমস্ত আশা, প্রতীক্ষা, সাধুসঙ্গের ফল, প্রিয়বাক্য প্রয়োগের ফল, যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন ফল—এই সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যায়।

যমরাজ তখন নচিকেতার যথোচিত অভ্যর্থনা করে বললেন, তুমি অতিথি এবং আমার নমস্য। অথচ তিনটি রাত্রি আমার গৃহে অনাহারে কাটিয়েছ। সেজন্য তোমাকে নমস্কার করছি। এখন এই তিনরাত্রির প্রতিটির জন্য তুমি একটি করে বর প্রার্থনা কর। অর্থাৎ মোট তিনটি বর আমি তোমাকে দেব।

নচিকেতা উত্তর দিলেন, হে যমরাজ, আমি এখন প্রেতলোকে প্রেত হয়েই এসেছি, মর্তলোকের কারো সঙ্গে আমার আর কোনো পরিচয় থাকার কথা নয়। কিন্তু আমার পিতা গৌতমের সঙ্গে যেন আমার ওই ধরনের সম্পর্ক না হয়। তিনি যেন আমাকে ঠিকমতো চিনতে পারেন। তাঁর সঙ্গে যেন আমার আগের মতোই

মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

যক্ষ হাসিমুখে বললেন, তথাস্তু নচিকেতা। তাই হবে। তোমার পিতা আরুণি উদ্দালক আগে তোমার প্রতি নরম স্নেহশীল ছিলেন, এখন থেকে ফিরে যাওয়ার পরেও তোমাকে চিনতে পেরে তিনি ঠিক একই রকম থাকবেন। আমার আদেশে তোমার প্রতি সম্পূর্ণ ক্রোধশূন্য হয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাবেন। এবার তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।

নচিকেতা বললেন, আপনার কোনো প্রভাব নেই বলে স্বর্গলোকে কোনো ভয় নেই। পৃথিবীবাসীর মতো সেখানে কেউ জরা বার্ধক্যে আক্রান্ত হয়েও শঙ্কিতমনা হয়ে থাকে না। স্বর্গলোকের বাসিন্দারা ক্ষুধা তৃষ্ণা অতিক্রম করে, দুঃখ জয় করে, আনন্দে দিন কাটায়। হে যমরাজ, স্বর্গকামী যজমানেরা যে অগ্নিবিদ্যার সাহায্যে অমরত্ব লাভ করেন, আপনি সেটি আমাকে বলুন। এই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা।

যম উত্তর দিলেন, আমি অবশ্যই সেই অগ্নিবিদ্যার স্বরূপ জানি। তোমাকে বলছি। একাগ্রচিত্তে তুমি শোনো। জেনে রেখো, ওই অগ্নি স্বর্গপ্রাপ্তির ওপরে এবং সারা জগতের আশ্রয়। এবং বিধানদের বিধান এই অগ্নিই রয়েছে।

প্রচুর যত্নের ফলে নচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যা শিখিয়ে

ছিলেন যম। নচিকেতার মহান একাগ্রতা দেখে খুশি হয়ে বললেন, শোনো কিশোর, তোমার অতুলন মানসিকতা আমাকে আশ্চর্য ও মুগ্ধ করেছে। এই কারণে আমি তোমাকে চতুর্থ একটি বরও দান করছি। আজ থেকে এই অগ্নি তোমারই নামে প্রসিদ্ধ হবে। এই শব্দময় এবং বহু রত্নখচিত মালাটিও আমি তোমাকে দিলাম। এই অগ্নির নাম হবে নাচিকেত অগ্নি। মা, বাবা এবং আচার্য এই তিনজনের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করবেন, তিনি জন্মমৃত্যু অতিক্রম করবেন। এই নাচিকেত অগ্নিকে আত্মাস্বরূপ জেনে যিনি তাঁর ধ্যান করবেন, দেহত্যাগের আগেই তিনি সকলরকম দুঃখ জয় করে চির আনন্দ ভোগ করবেন। আজ থেকে সকলে তোমারই নামে এই অগ্নিকে অভিহিত করবে। এবার তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

নচিকেতা বললেন, মানুষের মৃত্যুর পরে একটি সংশয় উপস্থিত হয়। কেউ বলেন, পরলোকগামী আত্মা আছেন। আবার কেউ বলেন, নেই। আপনি আমাকে আত্মার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নিয়ে বলুন। এই আমার তৃতীয় প্রার্থনা। নচিকেতাকে পরীক্ষা করার জন্য যম বললেন, এই বিষয়টির ব্যাপারে সমগ্র দেবতাদেরও সংশয় ছিল। এই আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সহজে জানাও যায় না। প্রিয় কিশোর, তুমি এটি বাদ দিয়ে অন্য বর প্রার্থনা কর।

এ বিষয়ে আমাকে কোনো অনুরোধ করো না।

নচিকেতা বললেন, কিন্তু যমরাজ, আমি তো জানি এই আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে আপনার চাইতে ভাল আর কেউ জানে না। অতএব এই প্রার্থনা ছাড়া আমার কোনো প্রার্থনা নেই, আমি আর কিছু চাই না।

—সেকি? তুমি আর কিছুই চাও না?

—না যমরাজ। আপনি শুধু এইটি আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

যম বললেন, তুমি দীর্ঘায়ু প্রার্থনা কর। চূড়ান্ত সুখী জীবন প্রার্থনা কর। এমন কি যতদিন তুমি বাঁচতে চাও, ততদিন স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারো, কিংবা যদি বিপুল ঐশ্বর্য, এবং যাবতীয় দুর্লভ কাম্যবস্তু চাও, আমি তোমাকে দিতে পারি। ধনরত্ন, দারুণ রূপসী নারী সব আমি তোমাকে দিতে পারি, তুমি শুধু মৃত্যু বিষয়ে এ ধরনের প্রশ্ন করো না।

নচিকেতা হেসে বললেন, ভোগী জীবনের প্রতি কোনোরকম আসক্তি নেই আমার। আপনার দেওয়া ভোগ্যবিষয়গুলি শুধু ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্ষয় করে। ওসব আমি চাই না। আমার প্রার্থনা ওইটিই। আপনি আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বলুন।

যম তখন হাসিমুখে বললেন, প্রিয় কিশোর, আমি বুঝতে পেরেছি, পার্থিব কোনো প্রলোভন তোমাকে

কখনো বশ করতে পারবে না। তুমি এসবের অনেক ওপরে। তোমাকে আমি পরীক্ষা করছিলাম। এবার তুমি আত্মতত্ত্ব বিষয়টি আমার কাছে শোনো।

সশ্রদ্ধস্বরে নচিকেতা বললেন, আমি শুনতে প্রস্তুত যমরাজ।

যম বললেন, শোনো নচিকেতা, শ্রেয় এবং প্রেয় একত্রে মানুষকে আশ্রয় করে। ধীমান পুরুষ দুটিকে পরীক্ষার সাহায্যে আলাদা করে নিতে পারেন। প্রেয়র চাইতে শ্রেয় অবশ্যই ভাল। ধীমান পুরুষ সর্বদা শ্রেয়কেই চয়ন করে নেবেন। আর, অবিদ্যা ও বিদ্যা সবসময়ই পরস্পরবিরোধী। নচিকেতা, তুমি সারাজীবন বিদ্যাকে অনুসরণ করো। সংসারে যারা নিরন্তর আসক্ত এবং পার্থিব সুখের মোহে আচ্ছন্ন, সেই সমস্ত অবিবেকীর কাছে পরলোক-সম্পর্কিত সাধন উদ্ভাসিত হয় না। এদের ধারণা, পরলোক বলে কিছু নেই। শুধুমাত্র দৃশ্যমান অর্থাৎ ইহলোক রয়েছে, পরলোক ধারণা ভ্রান্ত —এরকম যারা মনে করে, বারে বারে তারা মৃত্যুর কাছে পরাভূত হয়। আত্মতত্ত্ব বিষয়টি এমনই জটিল এবং এতদূর অজানা, সাধারণ মানুষের শোনার সৌভাগ্য পর্যন্ত হয় না। কিংবা শুনলেও সেটা বুঝবার ক্ষমতা হয় না। আত্মার উপদেষ্টা চিরকালই দুর্লভ এবং বিরল। এ-সংক্রান্ত জ্ঞান সকলে অর্জন করতে পারে না। আত্মা চিরকালই তর্কের অতীত।

তোমার মতো সৎ এবং সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আমি বেশি দেখিনি। প্রিয় কিশোর, তোমার মতো জিজ্ঞাসু মানুষ যেন বারে বারে আমাদের কাছে আসে। ......
এরপর যম 'সবিস্তারে আত্মতত্ত্বের গূঢ় ধারণাগুলি নচিকেতাকে বুঝিয়ে বললেন।
নচিকেতা জানলেন, ব্রহ্মের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আত্মা জন্মহীন, বিনাশহীন, নিত্য এবং শাশ্বত, দেহের সমাপ্তি ঘটলেও আত্মার কখনো সমাপ্তি ঘটে না। আত্মা সর্বদা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সর্বদা বিরাট থেকে বিরাটতর। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এর অবস্থান। বিশুদ্ধ মানসিকতার পুরুষ এঁকে দর্শন করে সকল শোক তাপকে জয় করেন। আত্মার গতি অবাধ, তাঁর বিচরণ সর্বত্র। প্রচুর পড়াশুনো করলেও এই অনন্ত আত্মাকে জানার কোনো উপায় নেই। শুধু যাঁকে তিনি অনুগ্রহ করবেন একমাত্র তাঁরই সামনে প্রকাশিত হয়ে থাকেন। একারণে তিনি স্বপ্রকাশ। ইত্যাদি।

অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ

পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা

ব্রহ্মা অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম, তিনি অব্যক্ত এবং সনাতন। সর্বভূতে তাঁর অবস্থান। তিনি অচিন্ত্য। স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছিলেন বলে তিনি স্বয়ম্ভূ। তিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা।

তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম অথর্বা। এঁকে তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যা উপদেশ করেছিলেন। অথর্বা সেই কথাগুলি বললেন অঙ্গিরকে। অঙ্গির বললেন, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবহকে। সত্যবহ বললেন, অঙ্গিরাকে। এরপরে গৃহস্থশ্রেষ্ঠ শৌণক এসে অঙ্গিরাকে জিগ্যেস করলেন, কোন বিষয়টি জানতে পারলে সব কিছু জানা যায়?

অঙ্গিরা বললেন, দুটি বিদ্যা জানার আছে।

—সেই দুটি বিদ্যার নাম কি?

—পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা।

—পরা বিদ্যা কাকে বলে ?

—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এরা সব অপরা বিদ্যা। এদের মধ্যে শিক্ষা অর্থাৎ বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ক গ্রন্থ। কল্প অর্থাৎ শ্রৌত কর্মানুষ্ঠানের জ্ঞাপক সূত্রগ্রন্থ। নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক শব্দাবলীর অর্থপ্রকাশক গ্রন্থ। ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্র্যাদি ছন্দের প্রকাশক গ্রন্থ।

শৌণক জিগ্যেস করলেন, আর পরা বিদ্যা কি ?

অঙ্গিরা উত্তর দিলেন, যে বিদ্যার সাহায্যে সেই অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায়। এই ব্রহ্ম থেকেই ইহজগতের যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হয়।

ভৃগুর ব্রহ্মজ্ঞান

বরুণপুত্র ভৃগু একবার তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন।

বরুণ উত্তর দিলেন, ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার হচ্ছে দেহ, প্রাণ, চোখ, কান, মন এবং বাক্। ব্রহ্ম থেকেই এই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি, তিনিই এই নিখিল বিশ্বের পালক। লয়প্রাপ্ত হওয়ার পরে সমস্ত কিছু ব্রহ্মেই গমন করে, তাঁরই মধ্যে বিলীন হয়। তুমি তপস্যা করে তাঁকে জানার চেষ্টা কর।

ভৃগু তপস্যা করলেন। জানতে পারলেন, অন্নই ব্রহ্ম। কেননা, অন্ন থেকেই সবকিছুর জন্ম, জন্মের পরে অন্নের দ্বারাই জীব প্রাণধারণ করে। লয়ের পরে অন্নের দিকে প্রতিগমন করে এবং অন্নে বিলীন হয়। তখন তিনি আবার পিতার কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে আরো ব্রহ্মোপদেশ করুন।

বরুণ বললেন, তুমি আরো তপস্যা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।

ভৃগু বললেন, আমার প্রথম তপস্যা সম্পূর্ণ হয় নি। কেননা অন্ন ব্রহ্ম হতে পারে না।
—একথা কেন বলছ?
—কারণ, অন্নের উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে। অতএব অন্ন ব্রহ্ম হতে পারে না।
—তাহলে তুমি আরও তপস্যা কর।
এবারে তপস্যা করে ভৃগুর মনে হলো প্রাণই ব্রহ্ম। কেননা প্রাণ থেকেই সবকিছু উৎপন্ন হয়, প্রাণের দ্বারা

পালিত হয়, প্রাণেই লীন হয়। ভালো করে চিন্তা করলেন ভৃগু। এবারে মনে হলো, প্রাণই ব্রহ্ম হতে পারে না। কেননা প্রাণেরও একটা পরিণাম আছে। অতএব প্রাণ ব্রহ্ম নয়।
আবার তিনি বরুণের কাছে গেলেন। বললেন, আপনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন।
বরুণ উত্তর দিলেন, তুমি তপস্যা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।
এবারে তপস্যা করে ভৃগুর ধারণা হলো, মনই ব্রহ্ম। কেননা মন থেকেই সবকিছুর জন্ম, মনের দ্বারাই বৃদ্ধি এবং

মনেই লয়। কিন্তু মন তো অনিশ্চয়তাত্মক। মন কিভাবে ব্রহ্ম হবে ?
ভৃগু আবার গেলেন বরুণের কাছে।
বরুণ উপদেশ দিলেন, তুমি তপস্যা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।
এবারে তপস্যা করে ভৃগুর মনে হলো, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। কারণ, বিজ্ঞান থেকেই এই বিশ্বচরাচরের জীববর্গ জাত হয়, বিজ্ঞানের দ্বারা পালিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানেই বিলীন হয়। কিন্তু এইসঙ্গে একথাও ভৃগুর মনে হলো, সুখ-দুঃখের অনুভূতি বিজ্ঞানের মধ্যে পড়ে। বিজ্ঞানে তো পূর্ণ আনন্দ নেই। সুতরাং বিজ্ঞান ব্রহ্ম হতে পারে না।
আবার তিনি বরুণের কাছে গেলেন। বরুণ বললেন, তপস্যা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।
এবারে তপস্যা করে ভৃগুর মনে হলো, আনন্দই ব্রহ্ম। কেননা আনন্দ থেকেই সবকিছুর জন্ম হয়, আনন্দের দ্বারাই বর্ধিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত আনন্দে বিলীন হয়। শেষবারের তপস্যায় উপলব্ধি এই জ্ঞান ভালোভাবে চিন্তা করে নিলেন ভৃগু। তারপর বরুণের কাছে এসে বললেন, পিতা,আমি ব্রহ্মকে জেনেছি।
—কি জেনেছ ?
—আমি জেনেছি, আনন্দই ব্রহ্ম। এই পরমানন্দের স্বাদ যিনি পেয়েছেন, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়।

সত্যকাম জাবাল

সত্যকাম তাঁর জননী জবালাকে বললেন, মাগো। আমি ব্রহ্মচর্য নিয়ে গুরুগৃহে বসবাস করব। তুমি আমাকে বলে দাও আমি কোন্ গোত্রীয় ?

জবালা উত্তর দিলেন, তোমার গোত্র আমি জানি না সোনা। আমার যৌবনে সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকার দরুন তোমার পিতার কাছে গোত্র জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পাই নি। তোমার পিতা যৌবনেই পরলোক গমন করেন। শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম বলে অন্য কারোর কাছে গোত্র জিগ্যেস করি নি। তোমার নাম সত্যকাম। গুরুগৃহে তুমি সত্যকাম জাবাল বলেই পরিচয় দিও।

সত্যকাম গেলেন হরিদ্রুমৎ-তনয় গৌতমের কাছে। বললেন, আমি আপনার কাছে ব্রহ্মচর্যবাস করব। আপনি আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন।

গৌতম তাঁকে জিগ্যেস করলেন, তোমার গোত্র কি ?

—গোত্র তো আমি জানি না।

—সে কি!

—হ্যাঁ আচার্য! আমার কি গোত্র, আমি জানি না।

—তোমার পিতামাতাকে জিগ্যেস কর নি?

—আমার পিতা বহুদিন আগে গত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি।

—তিনি কি বললেন?

—মা বললেন, আমার জন্মের সময় তিনি সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকতেন। সুতরাং আমার গোত্র জানার সুযোগ

সত্যকাম বলল, মাগো, আমি কোন্ গোত্রীয়?

তিনি পান নি। আমার মায়ের নাম জবালা। আমার নাম সত্যকাম। আমাকে তিনি সত্যকাম জাবাল নামে

পরিচয় দিতে বলেছেন।
আচার্য গৌতম খুশী হয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ বলতে পারে না। তুমি সত্যভ্রষ্ট হও নি দেখে প্রীতি হয়েছি। যাও, সমিধ নিয়ে এসো। আমি তোমাকে উপনীত করব।
এরপর গৌতম সত্যকামের হাতে চারশো দুর্বল গরু দিয়ে বললেন, এদের দায়িত্ব তোমার ওপর দিলাম।
চারশো গরু নিয়ে যাওয়ার সময় সত্যকাম বললেন, এই গরু হাজারে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরব না।
দীর্ঘকাল প্রবাসে রইলেন সত্যকাম। ইতিমধ্যে তাঁর শ্রদ্ধা ও তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে অনুগ্রহ করার জন্যে দিকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বায়ু বৃষের দেহে প্রবেশ করেছেন। একদিন সেই বৃষভ তাঁকে বললেন, আমাদের সংখ্যা এখন হাজারে দাঁড়িয়েছে। আচার্যের কাছে আমাদের নিয়ে চল সত্যকাম।
রওনা হওয়ার আগে বৃষভ বললেন, দেখো সত্যকাম, আমি তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ সম্পর্কে উপদেশ দিতে চাই।
সত্যকাম উত্তর দিলেন, বলুন আপনি। আমি শুনব। বৃষভ তাঁকে উপদেশ দিলেন, পূর্বদিক এক অংশ, পশ্চিম দিক এক অংশ, উত্তর দিক এক অংশ, আর দক্ষিণ দিক

এক অংশ। জেনে রেখো সত্যকাম, এই হচ্ছে ব্রহ্মের চারটি কলাবিশিষ্ট একটি পাদ। ব্রহ্মের এই চতুষ্কল একটি পাদকে এভাবে জেনে যদি কেউ তাঁর উপাসনা করেন, নরলোকে সে বিখ্যাত হয়। এবং পরলোক এবং অন্যান্য লোকও তার করায়ত্ত হয়। এবার চল। অগ্নি তোমাকে একপাদ বলবেন।

পরের দিন সত্যকাম সহস্র গরু নিয়ে গুরু-গৃহের দিকে রওনা হলেন। সন্ধেবেলা একটি জায়গায় তিনি নামলেন। সেখানে আগুন জ্বালান হলো। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির পেছনে পূর্বমুখী হয়ে তিনি বসলেন।

অগ্নি বললেন, সত্যকাম, আমি তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ বলব। পৃথিবী একটি অংশ। অন্তরীক্ষ একটি অংশ, দ্যুলোক একটি অংশ এবং সমুদ্র একটি অংশ। এই হচ্ছে ব্রহ্মের অনন্তবান নামে চতুষ্কল একটি পাদ। এইভাবে ব্রহ্মকে জেনে যদি কেউ অনন্তবান ভেবে তাঁর উপাসনা করতে পারে, পরলোকে সে অক্ষয়লোক জয় করেন। আমার আর বলার কিছু নেই। এবার হংস তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ সম্পর্কে উপদেশ দেবেন।

এরপর হংস সত্যকামের কাছে দৌড়ে এসে বললেন, শোনো সত্যকাম, আমি তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলব।

সত্যকাম উত্তর দিলেন, হে শ্রদ্ধেয় আপনি বলুন। আমি শুনব।

হংস বললেন, অগ্নি এক অংশ, সূর্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ আর বিদ্যুৎ এক অংশ। চতুষ্কল এই পাদটির নাম জ্যোতিষ্মান। ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এইরকম জেনে যদি কেউ তাঁকে জ্যোতিষ্মান বলে উপাসনা করে, সে তাহলে এই লোকে জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠতে পারে। আমি আর কিছু বলব না। মদ্‌গু[1] তোমাকে একটি পাদ বলবেন।

পরদিন সত্যকামের সঙ্গে মদ্‌গুর দেখা হল। মদ্‌গু তাকে বললেন, শোন সত্যকাম, প্রাণ এক অংশ, চোখ এক অংশ, শ্রোত্র এক অংশ, মন এক অংশ। ব্রহ্মের চতুষ্কল এই পাদটির নাম আয়তনবান। ব্রহ্মকে যে এইভাবে উপাসনা করে, পরলোকে বহু কিছু তার করায়ত্ত হয়।

এরপর সহস্র গরু নিয়ে সত্যকাম গুরু-গৃহে উপস্থিত হলেন। গুরু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল সত্যকাম, কে তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন?

সত্যকাম উত্তর দিলেন, কোন মানুষ আমাকে উপদেশ দেন নি। মানুষ ছাড়া আর সকলে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন।

গুরু বললেন, তোমার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে

---

১. মদ্‌গু অর্থাৎ এক ধরনের পাখি। জলের সঙ্গে সম্পর্কের দরুন একে প্রাণ বলা হয়। কেননা দেহে প্রাণের অবস্থান জলের ওপর নির্ভরশীল। জলাভাবে প্রাণত্যাগ হয়।

কারও কাছে উপদেশ পেয়ে তুমি ধন্য হয়েছ। অথচ তুমি আমার শিষ্য। অন্য গুরু কিভাবে তোমাকে উপদেশ দিলেন ?

সত্যকাম বললেন, হে ভগবন্, আমি তো বলছি, আপনিই আমার গুরু। আর মানুষ ছাড়া অন্যান্যরা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু এই সঙ্গে একথাও তাঁরা বলেছেন, গুরুমুখে বিজ্ঞাত বিদ্যাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম সম্পর্কে আমি যা জেনেছি, তা সম্পুর্ণ হবে যদি আপনি স্বয়ং আমাকে উপদেশ দেন।

এই বলে সত্যকাম গুরুর কাছে তাঁর সাম্প্রতিক অর্জিত বিদ্যাগুলি ব্যাখ্যা করলেন। ব্রহ্ম সম্পর্কে বৃষভ, অগ্নি, হংস এবং মদ্‌গু তাঁকে যা-যা বলেছেন, সব তিনি গুরুকে জানালেন। গুরুও তাঁকে সেইগুলিই আবার ভালভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন। বিষয়টি সম্পুর্ণভাবে সত্যকামের জানা হয়ে গেল।

উপকোসলের গল্প

উপকোসল কামলায়ন সত্যকাম জাবলের আশ্রমে ব্রহ্মচর্য পালন করছিলেন। সমাবর্তনের সময় কিন্তু সত্যকাম উপকোসলকে বাদ দিয়ে অন্যান্য ছাত্রের সমাবর্তন করালেন। ব্যাপারটা সত্যকামের স্ত্রীর ভাল লাগল না। তিনি স্বামীকে বললেন, উপকোসলকে তুমি বাদ দিলে কেন? ও কি অপরাধ করেছে? সত্যকাম স্ত্রীর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে প্রবাসে চলে গেলেন।

মনের দুঃখে উপকোসল অনশন শুরু করলেন। গুরুপত্নী তাঁকে বললেন, প্রিয় ব্রহ্মচারী, তুমি আহার ত্যাগ করেছ কেন?

উপকোসল উত্তর দিলেন, আমার মন অত্যন্ত খারাপ। অন্তরের যন্ত্রণায় আমি জর্জরিত। সুতরাং আহারের কথা আমাকে বলবেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গুরুগৃহে উপকোসল বারো বৎসর অগ্নিসকলের পরিচর্যা করেছিলেন। এতে অগ্নিগণ

তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

উপকোসলের মন খারাপ দেখে অগ্নিগণ নিজদের মধ্যে পরামর্শ করে তাঁকে উপদেশ দিতে এলেন। উপকোসলকে তাঁরা বললেন, শোন উপকোসল, প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম।

উপকোসল উত্তর দিলেন, প্রাণকে আমি ব্রহ্ম বলেই জানি। কিন্তু ক এবং খ-কে আমি জানি না।

অগ্নিগণ বললেন, ক এবং খ ভিন্ন নয়।

উপকোসল বললেন, প্রাণের ওপর মানুষের জীবন নির্ভর করে। সুতরাং প্রাণকে ব্রহ্ম বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ক অর্থাৎ অনিত্য বিষয়সুখ এবং খ অর্থাৎ জড় আকাশ। এরা কিভাবে ব্রহ্ম হবে?

অগ্নিগণ তখন উপকোসলকে ক এবং খ ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, ক জাগতিক সুখ নয় এবং খ নিছক জড় আকাশ নয়। এদের মধ্যেই কারণব্রহ্ম এবং আনন্দব্রহ্ম রয়েছেন। তাঁদেরই উপাসনা করা দরকার।

এরপর গার্হপত্য অগ্নি[১] তাঁকে বললেন, পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন এবং আদিত্য আমারই দেহ। সৌরমণ্ডলের পুরুষই আমি। এইভাবে যদি কেউ উপাসনা করতে পারে, তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। বংশ রক্ষা হয়। ইহলোকে ও পরলোকে একে আমরা রক্ষা করি।

এরপর দক্ষিণাগ্নি উপকোসলকে বললেন, জল, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্ররাজি এবং চন্দ্রমা আমারই দেহ। চন্দ্রমণ্ডলে এই যে পুরুষ তুমি দ্যাখো, তিনি আমি।

এরপরে আহ্বনীয়াগ্নি[২] তাঁকে বললেন, প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক, বিদ্যুৎ এরা আমার দেহেরই বিভিন্ন ভাগ। বিদ্যুতের মধ্যে যে পুরুষকে দ্যাখো তিনি আমি।

এই সমস্ত উপদেশ দেওয়া শেষ করে অগ্নিগণ উপকোসলকে বললেন, আমরা তোমাকে অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা দিলাম। এখন আচার্য সত্যকাম তোমাকে গতি উপদেশ দেবেন।

প্রবাস জীবন কাটিয়ে আচার্য ফিরে এলেন। উপকোসল গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতে তিনি বললেন, প্রিয় উপকোসল, তোমার মুখে-চোখে ব্রহ্মজ্ঞের দীপ্তি। কে তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন?

উপকোসল হাসিমুখে বললেন, কে আবার উপদেশ দেবেন?

---

১. গৃহস্থের অগ্নি। দিন-রাত জ্বালানো থাকে।

২. আহ্বনীয় দেবতাদের অগ্নি।

সত্যকাম বুঝতে পারলেন, উপকোসল সত্যি কথা বলছেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, বল উপকোসল, কে তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন? উপকোসল বাধ্য হয়ে তখন অগ্নিদের উল্লেখ করলেন। অগ্নিগণ তাঁকে যা-যা উপদেশ দিয়েছেন, সবই বললেন। সত্যকাম তখন শান্তভাবে বললেন, হ্যাখো উপকোসল, ওঁরা তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন, ঠিক আছে। আমি তোমাকে তোমার অভীষ্ট বিষয় জানাব। এই বিষয় জানতে পারলে পাপ কখনো তোমাকে স্পর্শ করবে না।

উপকোসল উত্তর দিলেন, আপনি আমাকে বলুন গুরুদেব। সত্যকাম বললেন, অক্ষিগোলকে যে পুরুষকে দেখা যায়, তিনিই আত্মা। এই আত্মা অমর। সকল প্রকার ভয়ের অতীত। ইনিই ব্রহ্ম। ইনি নিখিল মঙ্গলের একমাত্র আশ্রয়। এইভাবে যিনি জানেন, অপার মঙ্গল তাঁকে আশ্রয় করে। ইনিই আবার বামনী। কেননা সার্বিক পুণ্যফলের বাহক অথবা বিধাতা তিনি। ইনিই আবার ভামনী।[১] এই সমস্ত জ্ঞান যিনি অর্জন করেছেন, মৃত্যুর পরে তার শবক্রিয়া হোক বা না হোক, তিনি ব্রহ্মলাভ করেন। মানবীয় আবর্তে তিনি আর কষ্ট পান না।

---

১. ভাম অর্থাৎ দীপ্তিকে যিনি বহন করেন কিংবা প্রাপ্ত করান, তিনি ভাম-নী।

মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব

একবার বিভিন্ন প্রাণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে কিছুতেই কোনো সমাধানে পৌঁছোতে পারছিলেন না। সুতরাং বাধ্য হয়ে তাঁরা মীমাংসার জন্য প্রজাপতির দরবারে হাজির হলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বলে দিন, কে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ?

প্রজাপতি উত্তর দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দেহ থেকে বেরিয়ে গেলে শরীরটি সবচাইতে বেশি অশুচি বলে মনে হবে, সেই শ্রেষ্ঠ।

প্রথমে বাক্ দেহ থেকে বেরিয়ে গেলেন। এক বছর প্রবাসে কাটিয়ে ফিরে এসে বললেন, আমার অভাবে তোমরা কিভাবে জীবন কাটালে ? আর সকলে উত্তর দিলেন, বোবা যেমন ভাবে জীবন কাটায়, আমরাও সেভাবে জীবন কাটিয়েছি। অর্থাৎ বাক্শক্তি ছিল না বটে, তবে নাক দিয়ে শ্বাস নিয়েছি, চোখ দিয়ে দেখেছি, কানের

দ্বারা শুনেছি, মনের সাহায্যে চিন্তা করেছি। মোটমাট কথা বলা ছাড়া সবই করেছি। বেঁচে থাকতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

বাধ্য হয়ে বাক্ তখন আবার দেহে প্রবেশ করলেন।

এরপর চোখ দেহ থেকে ছেড়ে চলে গেলেন। এক বছর পরে ফিরে এসে জিগ্যেস করলেন, আমার অভাবে তোমরা কেমন করে বেঁচে ছিলে?

আর সকলে উত্তর দিলেন, অন্ধ যেভাবে বেঁচে থাকে, আমরাও সেভাবে বেঁচে থেকেছি। অর্থাৎ কথা বলেছি, শ্বাস নিয়েছি, চিন্তা করেছি, কানে শুনেছি, শুধু চোখে দেখি নি।

বাধ্য হয়ে চোখ আবার দেহে প্রবেশ করলেন।

এবার কান দেহ ছেড়ে চলে গেলেন। এক বছর পর ফিরে এসে জিগ্যেস করলেন, আমার অভাবে তোমরা কি ভাবে বেঁচে ছিলে?

আর সকলে বললেন, কানে না শুনে লোকে যে ভাবে বেঁচে থাকে আমরাও সেভাবে বেঁচে ছিলাম। অর্থাৎ কানে শুধু শুনি নি। আর সবই করেছি। বেঁচে থাকতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

বাধ্য হয়ে কান আবার দেহে প্রবেশ করলেন।

এরপর মন দেহ ছেড়ে চলে গেলেন। এক বছর বাদে ফিরে এসে বললেন, আমি তো ছিলাম না। কেমন করে

তোমরা বেঁচে রইলে ?
অন্যেরা উত্তর দিলেন, আমরা শুধু চিন্তা করি নি। আর সবই করেছি। বেঁচে থাকতে কোনো সমস্যাই হয় নি।
অগত্যা বাধ্য হয়ে মন আবার দেহে প্রবেশ করলেন।
এবার মুখ্যপ্রাণ স্বয়ং দেহ ছেড়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করলেন। এতে নিদারুণ বিপাকে পড়লেন বাকী সকলে। সবাই মিলে মুখ্যপ্রাণকে কাতর অনুরোধ করলেন, হে প্রভু, আপনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দয়া করে আপনি দেহ ছেড়ে যাবেন না।
এইভাবে মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো।
মুখ্যপ্রাণ জিগ্যেস করলেন, আমার অন্ন এবং পরিধেয় কি হবে ?
অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরা বললেন, সমস্ত প্রাণীর যা কিছু অন্ন রয়েছে, সেই সবই আপনার অন্ন হবে।
—আর আমার পরিধান ?
—জল আপনার পরিধেয় হবে। জলই আপনার নগ্নতা দূর করবে।

শ্বেতকেতু-প্রবাহন সংবাদ

অরুণের পৌত্র শ্বেতকেতু একবার পঞ্চাল জনপদের সভায় উপস্থিত হলেন। জাবল পুত্র প্রবাহন তাঁকে বললেন, কি গো কুমার, পিতার কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছ তো ?

—পেয়েছি। শ্বেতকেতু উত্তর দিলেন।

—আচ্ছা বেশ, তাহলে বল দেখি সমস্ত জীব এই লোক থেকে ওপরে কোথায় যায় ? বলতে পারবে ?

—না তো।

—কিভাবে তাঁরা ফিরে আসে, জানো কি ?

—না।

—আচ্ছা বেশ, তাহলে বল তো দেবযান ও পিতৃযান নামে যে দুটি মার্গ আছে, তারা কোথায় কতদূরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ? জানো কি ?

—না।

—এটাও জানো না ? আচ্ছা বেশ। এবার আরেকটি

প্রশ্ন করছি। বল তো চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না?
—জানি না।
—সে কি? আচ্ছা বল তো, পঞ্চম আহুতি দেওয়া হলে তরল আহুতিগুলি কিভাবে পুরুষ পদবাচ্য হয়?
—জানি না।
রাজা প্রবাহন অবাক হয়ে বললেন, কি আশ্চর্য তুমি তো কিছুই জানো না দেখছি। তবে যে বললে তোমার পিতা তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন? তুমি তো কিছুই জানো না।
মর্মাহত শ্বেতকেতু, বাড়ি ফিরে এলেন। পিতা গৌতমকে বললেন, আপনি আমাকে সমুচিত উপদেশ না দিয়েই বলেছিলেন, 'তোমাকে উপদেশ দিলাম।' আজ আমি সকলের সামনে ছোট হয়ে গেলাম।
—কেন? কি হয়েছে?
শ্বেতকেতু তখন প্রবাহনের প্রশ্নগুলি এবং যে বিষয়ে তাঁর ব্যর্থতা সে-কথা পিতাকে জানালেন। বললেন, উনি আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিগ্যেস করলেন, কিন্তু আমি একটারও উত্তর দিতে পারলাম না। আপনি তাহলে আমাকে কি উপদেশ দিলেন?
গৌতম দুঃখিতভাবে উত্তর দিলেন, আমি জানলে তোমাকে বলব না কেন? আসলে আমি নিজেই তো এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানি না। তুমি আমার প্রিয়

পুত্র। তোমাকে অদেয় আমার কি থাকতে পারে? এই প্রশ্নগুলি যখন তোমাকে আমি বলি নি, সেক্ষেত্রে তোমার বোঝা উচিত আমি নিজেই এগুলি জানি না। আগামী কালই আমি রাজার কাছে গিয়ে এসব জেনে আসব।

গৌতম বললেন, প্রিয় পুত্রকে অদেয় আর কি আছে?

পরদিন গৌতম রাজা প্রবাহনের সভায় উপস্থিত হলেন। প্রবাহন তাঁর যথাবিহিত অভ্যর্থনা করে বললেন, আপনি আমার কাছে কি চান বলুন? বিত্ত-চিত্ত সম্পদ সবই আপনাকে দিতে পারি। বলুন, কি

আপনি চান ?

গৌতম হেসে বললেন, হে রাজন্, ওসব বিত্ত সম্পদ আপনার থাক। শ্বেতকেতুকে আপনি যে-সব কথা বলেছিলেন, আমাকেও বলুন। বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি আপনার কাছে উপদেশ চাই।

গৌতমের অনুরোধ শুনে রাজা বিষণ্ণভাবে বললেন, দেখুন, আপনি ব্রাহ্মণ। এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ব্রাহ্মণের লভ্য নয়। বিশেষ করে ব্রাহ্মণকে উপদেশ দেওয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায়বিরুদ্ধ।

গৌতম বললেন, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ হয়ে নিজেই তো আপনাকে অনুরোধ করছি।

—সেই জন্যেই তো আমার আরো কষ্ট হচ্ছে। কেননা ব্রাহ্মণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাও অসম্ভব। ঠিক আছে, আমি আপনাকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ দেব। আপনি দীর্ঘকাল এখানে বাস করুন।

গৌতম রাজি হলেন।

দীর্ঘদিন বাদে রাজা গৌতমকে বললেন, আপনার আগে অন্য কোনো ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা অর্জন করেন নি। প্রাচীনকালে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরাই এই বিদ্যা-বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

গৌতম বললেন, আপনিও আমাকে উপদেশ দিন, রাজা।

রাজা বললেন, হে গৌতম, দ্যুলোকই অগ্নি। আদিত্য

স্বয়ং তার সমিধ। যাবতীয় কিরণ তার ধোঁয়া। দিবা-ভাগের নাম অগ্নিশিখা। চন্দ্র হচ্ছে তার অঙ্গার, আর নক্ষত্রবৃন্দ হচ্ছে সেই অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ।
গৌতম বললেন, বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে দিন।
রাজা বললেন, আহ্বনীয়াগ্নিতে যেমন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হয়, ঠিক সেই রকম দ্যুলোক এই অগ্নির অধিষ্ঠান। কেননা সূর্যের দ্বারা সেই অগ্নি নিরন্তর উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। সমিধ থেকে যেমন ধোঁয়া বেরোয়, সূর্য থেকেও ঠিক সেইরকম কিরণ বিকীর্ণ হয়। আর অগ্নি শান্ত হয়ে এলে অঙ্গারের প্রকাশ ঘটে। ঠিক সেইরকম সারা দিনের শেষে চন্দ্রের প্রকাশ দেখা যায়। এবং যাবতীয় নক্ষত্র বিস্ফুলিঙ্গের মতো এদিকে-সেদিকে ছাড়িয়ে রয়েছে। দেবতারা সেই আগুনে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। সমস্ত তরল আহুতি শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়া হয়। এরপরে শুনুন।—রাজা বলতে লাগলেন, শুনুন গৌতম, পর্জন্যই অগ্নি। বায়ু তার সমিধ। মেঘ তার ধোঁয়া। বিদ্যুতই অগ্নিশিখা। বজ্র এখানে অঙ্গার। এবং গর্জন হচ্ছে তার বিস্ফুলিঙ্গ। এই পর্জন্যাগ্নিতে দেবতারা সমুজ্জ্বল চন্দ্রকে আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকেই বৃষ্টি হয়।
গৌতম জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ?
রাজা বললেন, পৃথিবীই অগ্নি। সংবৎসর তার সমিধ। আকাশ তার ধোঁয়া রাত্রি, তার শিখা। যাবতীয় দিক্ তার

অঙ্গার। এবং দিক্ কোণাগুলি তার বিস্ফুলিঙ্গ। বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে বলছি, সংবৎসর-রূপ কাল পৃথিবীকে উদ্বোধিত করে ধান এক অন্যান্য শস্য উৎপাদনের জন্য তাকে সমর্থ করে তোলে। এই কারণে সংবৎসরকে আমি সমিধ বলছি। অগ্নি থেকে ধোঁয়া যেমন ওপরে ওঠে, ঠিক সেইরকম আকাশও যেন পৃথিবী থেকে ওপরে উঠেছে। এই আগুনে দেবতারা বৃষ্টিকে আহুতি দেন। তার থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়। আরো শুনুন। পুরুষই অগ্নি। বাক্ তার সমিধ। প্রাণ তার ধোঁয়া। জিহ্বা এক্ষেত্রে শিখা। চোখ হলো অঙ্গার। এবং শ্রোত্র অর্থাৎ কান তার বিস্ফুলিঙ্গ। অর্থাৎ বাক্‌রূপ সমিধ পুরুষকে উজ্জ্বল করে তোলে। মুখ থেকে প্রাণবায়ু ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে যায়। অঙ্গার হচ্ছে আলোর আশ্রয়। ঠিক সেই রকম চোখও আলোর আশ্রয়। এবং কর্ণরূপ বিস্ফুলিঙ্গ শ্রবণের জন্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এই অগ্নিতে দেবতারা অন্নকে আহুতি দেন।

পঞ্চম আহুতির সাহায্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে। তারপর সে দেহত্যাগ করে। দেহত্যাগের পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তাকে অগ্নির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অগ্নি থেকেই একসময় সে উৎপন্ন হয়েছিল। শুনুন গৌতম, এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা যাঁরা জানেন অর্চিরাভিমানী দেবতাকে তাঁরা পেতে পারেন।

গৌতম বললেন, 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' শব্দটি একটু ব্যাখ্যা করুন।

রাজা উত্তর দিলেন, সমস্ত অগ্নিহোত্রের আহুতি থেকে উৎপন্ন অপূর্ব, তাকেই জগৎ বলব। এই জগৎকে পাঁচভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে অগ্নিদৃষ্টি বিহিত হয়েছে। এ হেন দৃষ্টি আরোপ করে উপাসনা করলে উত্তরমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। এখন এই যে অর্চি, তার থেকে আসে অহঃ, অহঃ থেকে শুক্লপক্ষ থেকে উত্তরায়ণে, উত্তরায়ণ থেকে সংবৎসরে, সংবৎসর থেকে আদিত্যে, আদিত্য থেকে চন্দ্রে এঁরা গমন করেন। এবং চন্দ্র থেকেই লাভ করেন বিদ্যুদ্‌ভিমানী দেবতাকে। এরপরে ব্রহ্মলোক থেকে অমানব কোনো পুরুষ এসে এঁদের ব্রহ্মপ্রাপ্ত করান। এরই নাম দেবযান পথ। আবার যেসব গৃহস্থ ইষ্ট, পূর্ত, দত্ত জাতীয় অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা ধূমপ্রাপ্ত হতে পারেন। ধূম থেকে রাত্রি, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ থেকে দক্ষিণায়ণ গমন করেন। কিন্তু দেবযান পথের যাত্রীদের মতো এঁরা সংবৎসরকে পেতে পারেন না, অর্থাৎ তাঁরা উপাসক, তাঁরা সংবৎসরের অবয়ব উত্তরায়ণ ষন্মাসকে পেয়ে সংবৎসরে যাত্রা করে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হতে পারেন। কিন্তু যাঁরা কর্মী, তাঁরা শুধু দক্ষিণায়ণ ষন্মাসকেই পেতে পারেন, সংবৎসরকে পান না। এঁদের পথ পিতৃযান পথ। দক্ষিণায়ণ থেকে তাঁরা

পিতৃলোক এবং ক্রমশঃ চন্দ্রলোকে যাত্রা করেন। কর্মফল সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত এঁরা চন্দ্রলোকে বসবাস করেন। কর্মফল অনেক ধরনের রয়েছে। সুতরাং যে সব কর্মের ফলে চন্দ্রলোক লাভ হয়েছিল, শুধুমাত্র সেই কর্মফলগুলি ক্ষয় হলে চন্দ্রলোক থেকে পতন হয়। বাকি কর্মগুলির ফলে জীব সংসারে ফিরে জন্মগ্রহণ করে। যাই হোক, চন্দ্রলোক থেকে ফিরে এলে এঁরা আকাশকে পান, তারপর লাভ করেন বায়ুকে। বায়ু থেকে ধোঁয়া, তার থেকে অভ্র, অভ্র থেকে মেঘ। মেঘ থেকে বৃষ্টি। এরপরে এই ক্ষীণবর্মা প্রাণীরা এই লোকে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, ঘাস, তিল প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এসব থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন। দুঃসাধ্যও বলা চলে। কেননা বৃষ্টির জল কোথায় যে পড়বে, তার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। এদিকে সন্তান লাভে সমর্থ পুরুষ যদি এসব ভক্ষণ না করেন, তাহলে জীবের পক্ষে মাতৃগর্ভে যাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর! এমনিতেই ব্রীহি মধ্যে তিলভাব পাওয়াই কঠিন। এবং পুরুষ শরীরে গিয়ে সময়মতো মাতৃগর্ভে যাত্রা করা আরও কঠিন। তবু, সে যাই হোক, সন্তান লাভে সমর্থ কোনো পুরুষ যদি এসব অন্ন গ্রহণ করে তার সন্তান তারই আকার ধারণ ক'রে জাত হতে পারেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের ইহলোক অর্জিত শুভ অবশিষ্ট আছেন, তাঁদের জন্ম হয় ব্রাহ্মণ গৃহে, ক্ষত্রিয় গৃহে অথবা

বৈশ্য গৃহে। আবার যাঁদের ইহলোকে অর্জিত অশুভ কর্মফল অবশিষ্ট রয়েছে, তাঁদের জন্ম হয় কুকুর গর্ভে বা শূকর গর্ভে বা চণ্ডালগর্ভে। আর যাঁরা সমস্ত ধরনের শাস্ত্রীয় আচরণ থেকে বিমুখ, তারা এই দুটি পথের কোনোটিতেই যাত্রা করে না। এরা শুধু জন্মায় আর মরে। বারে বারে এদের জন্ম হয়, এবং বারে বারে মৃত্যু হয়। অতএব এই গতিকে ঘৃণা করা উচিত।

গৌতম জিগ্যেস করলেন, কারা পতিত হয়?

রাজা উত্তর দিলেন, যে সুবর্ণ অপহরণ করে, যে সুরাপান করে, যে ব্রহ্মঘাতী—এই ধরনের মানুষ পতিত হয়। আর যে মানুষ এদের সংসর্গ করে, সেও পতিত হয়। কিন্তু মনে রাখবেন, যদি কেউ পঞ্চাগ্নির যথাযথ উপাসনা করতে পারেন, তিনি এ হেন পাপীদের সংসর্গ করলেও কোনোরকম পাপে পড়েন না। কেননা তিনি বীতপাপ হয়ে সদা বিশুদ্ধ হন।

শ্বেতকেতু ও আরুণি

একদিন সকালবেলা অরুণপৌত্র শ্বেতকেতুকে তাঁর বাবা বললেন, শোনো শ্বেতকেতু, তোমার বয়স এখন কত হলো ?

শ্বেতকেতু তাঁর সঠিক বয়স জানেন না। মা রান্নাঘরে ছিলেন। তাঁকে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, মা আমার বয়স এখন কত-হয়েছে ?

—তোমার বারো বৎসর পূর্ণ হয়েছে। মা উত্তর দিলেন।

শ্বেতকেতু এসে বাবাকে বললেন, মা বললেন, আমার বয়স এখন বারো পূর্ণ হয়েছে।

—বারো বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমার কর্তব্য ব্রহ্মচর্য নিয়ে গুরুগৃহে বসবাস করা।

—কেন বাবা, ব্রহ্মচর্য নিয়ে গুরুগৃহে বসবাস করব কেন ?

বাবা হেসে বললেন, শোনো কথা, তোমাকে যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে হবে। ব্রহ্মবিদ্যা আর ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক রহস্যবিদ্যা।

শ্বেতকেতু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, এসব কি বিদ্যা বাবা ?

—সেইসব জানার জন্যই তো ব্রহ্মচর্য নিয়ে গুরুগৃহে বসবাস করা প্রয়োজন।

—বেশ। তাহলে আমাকে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দিন।

—ঠিক আছে। আমি দিনক্ষণ স্থির করে তোমাকে জানাব। তুমি গুরুগৃহে যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি অর্জন কর।

বাবার কথামতো বারো বৎসর বয়সে শ্বেতকেতু গুরুগৃহে গেলেন। যাওয়ার সময় মাকে প্রণাম করতে তিনি তাঁর চিবুক স্পর্শ করে বললেন, গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে ফিরে এসো বাবা।

—তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর মা।

—আমি এবং তোমার বাবা সবসময় তোমাকে আশীর্বাদ

করছি। যাও, সাকল্য অর্জন করে এসো।

গুরুগৃহ থেকে শ্বেতকেতু ফিরে এলেন চল্লিশ বছর বয়সে। এই কয়েক বৎসরে তিনি অনেক কিছু জেনেছেন, জানতে পেরেছেন। লাভ করেছেন বেদজ্ঞান। এবং এই সঙ্গে হয়ে উঠেছেন কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির।

পিতা আরুণিকে এসে তিনি প্রণাম করে দাঁড়ালেন। আরুণি বললেন, আমি তো দেখছি এই বারো বৎসরে তুমি বেশ গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে উঠেছ।

—আপনার সেরকম মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ। আরো মনে হচ্ছে, বেশ খানিকটা আত্মাভিমানও তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমার জানা প্রয়োজন, ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক রহস্যবিদ্যা সম্পর্কে তুমি কি জেনেছ?

শ্বেতকেতু বললেন, এটি কি ধরনের বিদ্যা আগে সেটি আমাকে বলুন। এটি কি ধরনের জ্ঞান?

আরুণি বললেন, এই জ্ঞানের সাহায্যে অশ্রুত জ্ঞান শ্রুত হয়।

—আর?

—আর অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয়।

—আর?

—আর অনিশ্চিত বিষয় সুনিশ্চিত হয়। এসব ব্যাপারে তুমি কি জেনেছ?

শ্বেতকেতু আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি তো সে-সব বিষয়ে

কিছুই জানতে পারিনি। আমার গুরুদেব তো কিছু বলেন নি।
আরুণি বললেন, সেকি পুত্র! আসল বিদ্যা তো তুমি কিছুই অর্জন কর নি দেখছি। তোমার গুরুদেব কেন তোমাকে এ বিষয়ে অজ্ঞ রেখে দিলেন?
গুরুগৃহে শ্বেতকেতু ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক রহস্যবিদ্যা কিছুই জানতে পারেন নি জেনে তাঁর মা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। বিষণ্ণস্বরে পুত্রকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, তোমার আরও একবার গুরুগৃহে যাওয়া উচিত।
আরুণিও স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ শ্বেতকেতু, আমিও ভাবছি আরেকবার তোমাকে গুরুর কাছে পাঠাব।
কিন্তু গুরুগৃহে দ্বিতীয়বার যাওয়ার কোনো ইচ্ছে শ্বেতকেতুর ছিল না। তিনি হাসিমুখে মাকে বললেন, আমার দারুণ খিদে পেয়েছে মা। আগে তুমি আমাকে কিছু খেতে দাও!
এক্ষুনি দিচ্ছি বাবা। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে মা রান্নাঘরে চলে গেলেন। শ্বেতকেতু আরুণির পাশে বসলেন। হেসে বললেন, আচ্ছা বাবা, আপনি কি আবার আমাকে গুরুগৃহে পাঠাতে চান?
আরুণি চিন্তিতভাবে উত্তর দিলেন, তাই তো ভাবছি পুত্র। নইলে প্রকৃত জ্ঞান তুমি অর্জন করবে কিভাবে?
শ্বেতকেতু বলে উঠলেন, কিন্তু বাবা আমার তো মনে

হচ্ছে, গুরুদেব এসব বিষয়ে কিছুই জানেন না। জানলে তিনি অবশ্য আমাকে এ বিষয়ে অজ্ঞ রেখে দিতেন না। আসলে নিজে তিনি অজ্ঞ বলেই আমাকে কিছু বলতে পারেন নি।

আরুণি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, এসব কথা কি তুমি গুরুনিন্দার অভিপ্রায় থেকে বলছ?

—না বাবা। গুরুনিন্দার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। আসলে আমি চাইছি আপনি স্বয়ং আমাকে শিক্ষা দিন। ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক রহস্যবিদ্যা আমি আপনারই কাছে জানতে চাই। আমাকে সেই বিদ্যা দান করুন।

—আমার কাছে তুমি উপদেশ চাইছ?

—হ্যাঁ বাবা। দ্বিতীয়বার আমাকে গুরুগৃহে পাঠাবেন না।

এমন সময় শ্বেতকেতুর মা পুত্রের জন্য জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আরুণি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ছেলের কথা শুনেছ? সে আমার কাছে জ্ঞানলাভ করতে চায়।

—এ তো খুব ভাল কথা। তুমি নিজে শিক্ষকের ভার গ্রহণ করলে দ্বিতীয়বার ওকে গুরুগৃহে যেতে হয় না। আমার মনে হয়, এতে ওর ভালই হবে।

—বেশ। আমিই ওকে বিদ্যা দান করব। তুমি ওকে খেতে দাও। বেচারি বড় ক্লান্ত হয়ে এসেছে। খাওয়া-দাওয়া

সেরে ও বিশ্রাম করুক। কাল সকালবেলা থেকে আমি ওকে নিয়ে বসব।

পরদিন সকালবেলা স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে শ্বেতকেতু এসে আরুণিকে প্রণাম করলেন। আরুণি তাঁকে আসন দেখিয়ে দিলেন। শ্বেতকেতু বসলেন। আরুণি বলতে শুরু করলেন, শোনো শ্বেতকেতু, সৃষ্টির আগে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ বিদ্যমান ছিলেন।

—তাঁর আগে সৃষ্টি বলে কিছু ছিল না?

—না। তিনিই প্রথম। তিনিই আদি।

—তারপর?

—সেই অদ্বিতীয় সৎ স্থির করলেন, আমি বল হব। এ কারণে তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। এবার সেই তেজ ভাবলেন, আমি বল হব। এই অভিপ্রায়ে তিনি জল সৃষ্টি করলেন। জেনে রেখো শ্বেতকেতু, তারপর থেকে মানুষ কাঁদলে কিংবা ঘর্মাক্ত হলে তেজ থেকে জল সৃষ্টি হয়।

শ্বেতকেতু বললেন, আসলে সর্বশক্তিমান ভগবান তেজ ও

অগ্নিরূপে উপস্থিত থাকেন।

—ঠিক বলেছ। আরুণি পুত্রের কথায় সায় দিলেন।

—তারপর?

আরুণি বললেন, তারপর জল স্থির করলেন, আমি বল হব। তখন অন্ন অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি হলো। তাই বৃষ্টি হলেই অন্ন উৎপন্ন হয়। আবার জল থেকে ভক্ষ্য অন্ন উৎপন্ন হয়। তারপর শোনো, অগ্নিতে যে রক্তবর্ণ আমাদের চোখে পড়ে, সেই হচ্ছে আগুনের রূপ। এবং অগ্নিতে যে শুক্লবর্ণ, সেটি হচ্ছে জলের রূপ।

—আর অগ্নিতে যে কৃষ্ণবর্ণ?

—সেটি হচ্ছে পৃথিবীর রূপ। এইভাবে যদি চিন্তা করতে পারো, তাহলে অগ্নি থেকে তোমার অগ্নিত্ববুদ্ধি চলে যাবে। জেনে রাখবে, একমাত্র সত্য এই তিনটি রূপ। এসব কথা কেমন লাগছে তোমার?

—খুব ভাল লাগছে। আমি সব বুঝতে পারছি। আপনি আরো বলুন।

আরুণি বললেন, আবার তুমি সূর্যে যে রক্তবর্ণ ত্থাখো, সেটি হচ্ছে তেজের রূপ। সূর্যে যে শুক্লবর্ণ, সেটি হচ্ছে জলের রূপ।

শ্বেতকেতু জিগ্যেস করলেন, আর সূর্যে যে কৃষ্ণবর্ণ?

—সেটি হচ্ছে পৃথিবীর রূপ। এভাবে চিন্তা করতে পারলে আদিত্য থেকে তোমার আদিত্যবুদ্ধি চলে যাবে।

তুমি বুঝতে পারবে, একমাত্র এই তিনটি রূপই সত্য। ঠিক এইরকম বিদ্যুতে যে রক্তবর্ণ, সেটি তেজের রূপ।

শ্বেতকেতু বললেন, এবার আমি বলছি বাবা।

—বল।

—বিদ্যুতে যে শুক্লবর্ণ, সেটি জলের রূপ। আর বিদ্যুতে যে কৃষ্ণবর্ণ, সেটি পৃথিবীর রূপ।

—ঠিক আছে। বুঝতে পারছি এই বিষয়টি ধীরে ধীরে তোমার বোধগম্য হচ্ছে। আরও শোনো।

—বলুন।

—জেনে রাখবে, অন্ন যখন ভক্ষিত হয়, তখন তিনটি চেহারা নেয়।

—কি রকম? শ্বেতকেতু জানতে চাইলেন।

—ভক্ষিত অন্নের স্থূলতম অংশটি পরিণত হয় মলে। মধ্যের অংশ পরিণত হয় মাংসে। আর সূক্ষ্মতম অংশ পরিণত হয় মনে। এই তত্ত্বটা কিছু বুঝতে পারলে?

শ্বেতকেতু বললেন, আপনি এই সূক্ষ্মতম অংশের ব্যাপারটা আরেকটু ব্যাখ্যা করুন।

আরুণি উত্তর দিলেন, ভক্ষিত অন্নের সূক্ষ্মাংশ সরাসরি মানব হৃদয়ে প্রবেশ করে।

—তারপর সেটি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্থিতির কারণ হয়। এইভাবে সে সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মনের পুষ্টিসাধন করে। জলও ঠিক এইরকম পীত হয়ে তিনটি চেহারা ধারণ করে। তার স্থূলতম অংশ পরিণত হয় মূত্রে, মধ্যের

অংশ পরিণত হয় রক্তে আর সূক্ষ্ম অংশটি পরিণত হয় প্রাণে। বুঝলে কিছু?

শ্বেতকেতু বললেন, প্রাণের ব্যাপারটি আরেকটু ব্যাখ্যা করুন।

আরুণি উত্তর দিলেন, প্রাণকে তুমি বিকার ভেবো না। কেননা জলের আগেই প্রাণের উৎপত্তি। তবে মনে রাখতে হবে, শরীরের ভেতরে প্রাণের অবস্থান। তাই সে জলের ওপর নির্ভরশীল। আবার ছাখো, তেজ অর্থাৎ তৈজস ঘৃতও ভক্ষিত হওয়ার পরে তিনটি আকার ধারণ করে। তার মধ্যে স্থূল অংশটি পরিণত হয় অস্থিতে, মধ্যের অংশটি পরিণত হয় মজ্জায় আর সূক্ষ্ম অংশটি পরিণত হয় বাক্যে।

—কি ভাবে?

আরুণি হাসিমুখে বললেন, এটা খুবই সহজ। ঘৃত ও অন্যান্য তৈজস পদার্থ সেবন করলে বাগ্মিতার পুষ্টি হয়। সুতরাং জেনে রাখো পুত্র, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়ী।

শ্বেতকেতু বললেন, এটা ঠিক বুঝলাম না।

—বেশ। আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভক্ষ্যমান অন্নের যেটি সূক্ষ্মাংশ, সেটি ওপরে উঠে মনে পরিণত হয়। অর্থাৎ মনকে পুষ্ট করে। আবার পীয়মান জলের সূক্ষ্মাংশ ওপরে উঠে প্রাণে পরিণত হয়। এবং ভুজ্যমান তেজের

সূক্ষ্মাংশ ওপরে উঠে বাক্ হয়।

শ্বেতকেতু বললেন, আপনি ওটা আমাকে আবার বুঝিয়ে দিন।

—বেশ। তাই দিচ্ছি। শোন, আজ থেকে পনেরো দিন কিছু আহার করবে না। শুধু যত ইচ্ছে জল খাবে।

—কেন বাবা ?

—কারণ প্রাণ জলময়। যে জল পান করে, তার প্রাণ-বিয়োগ হয় না।

পনের দিন শ্বেতকেতু কিছু আহার করলেন না। ষোড়শ দিনে আরুণিকে বললেন, বাবা বলে দিন, আমি এখন কি বলব ?

—তুমি ঋক, যজুঃ ও সাম উচ্চারণ কর।

—কিন্তু বাবা, ওসব তো আমার মনে একেবারেই আসছে না।

—কিছু বুঝতে পারছ ?

—না বাবা।

—এর বিশাল একটি অগ্নিকুণ্ড নিয়মিত জ্বলছিল। সব

কিছু তখন সে দগ্ধ করতে পারত। কিন্তু এখন অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র একটি অঙ্গার। তার দ্বারা কিছুই দগ্ধ হবে না। তোমারও তেমনি ষোড়শ কলার মধ্যে একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট আছে। একটা কাজ কর, তুমি আহার করে এসো। আহার না করলে বেদ বুঝতে পারবে না। আহার করে এসো। আমার কথা ঠিক বুঝতে পারবে।
শ্বেতকেতু আহার করে এলেন। আরুণি এবার তাঁকে যা যা বললেন, তিনি সব বুঝতে পারলেন।
আরুণি বললেন, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময় ?
শ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, পারছি।
কিছুদিন বাদে একদিন আরুণি পুত্রকে বললেন, শোনো শ্বেতকেতু, আজ তোমাকে স্বপ্নের মর্ম বুঝিয়ে দেব।
—বলুন।
—যখন বলি, অমুক গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তিনি তখন সতের দলে একীভূত হয়েছেন। এবং নিজ স্বরূপে গমন করেছেন। যেমন সুতোয় বাঁধা কোনো পাখি এদিক-ওদিক উড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে সেই সুতোকেই আশ্রয় করে, ঠিক তেমনি সেই জীব স্বপ্ন ও জাগরণে এদিক-ওদিক বিচরণ করে অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আত্মাকেই আশ্রয় করে। কেননা পরমাত্মাই জীবের আশ্রয়।

শ্বেতকেতু জিজ্ঞেস করলেন, এই দেহের কারণ কোথায় ? আরুণি উত্তর দিলেন, দেহের কারণ অন্ন। জেনে রেখো শ্বেতকেতু, সমস্ত চরাচর সৎ থেকেই উৎপন্ন, সতেই আশ্রিত ও সতেই বিলীন। তাঁরই দ্বারা এই জগৎ আত্মবান হয়ে রয়েছে। পরমার্থ সত্য তিনিই। আত্মা তিনিই। প্রিয়পুত্র তুমিই সেই সৎ। আসলে সমস্ত জীব সৎ। কিন্তু দুঃখ এই, সৎস্বরূপকে পেয়েও এই জীবেরা নিজেদের সৎস্বরূপ বলে ভাবতে পারে না। এরা সৎ থেকে এলেও জানতে পারে না, তাদের উৎপত্তিস্থল। জীব অবিনাশী। শরীর চলে যায়, জীব একই রকম থাকে। এরপর আরুণি বললেন, যাও তো শ্বেতকেতু, ওই বটগাছ থেকে একটি ফল নিয়ে এসো। শ্বেতকেতু নিয়ে এলেন। আরুণি বললেন, এবার এটিকে ভাঙো। শ্বেতকেতু ভাঙলেন।

—কি দেখছ ? আরুণি জিজ্ঞেস করলেন।

—অণুর মত বহু বীজ।

—এবার একটি বীজকে ভাঙো। কি দেখছ ?

—আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—কেন বলো তো ?

—জানি না পিতা।

—আসলে বীজের এই সূক্ষ্মাংশটি তুমি দেখতে পাবে না। কারণ এরই থেকে উৎপন্ন হয়ে এই মহাবটবৃক্ষটি দাঁড়িয়ে

আছে। সুতরাং শ্রদ্ধার সঙ্গে বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা করো। শ্রদ্ধা ছাড়া তুমি এটি বুঝতে পারবে না। এরপর আরুণি শ্বেতকেতুকে কিছুটা নুন দিয়ে বললেন, এটিকে একপাত্র জলে ফেলে রাখো।

পরদিন সকালে পুত্রকে তিনি সেই নুন নিয়ে আসতে বললেন। শ্বেতকেতু জলের মধ্যে অনেক খুঁজেও নুন পেলেন না। আরুণি তখন বললেন, তুমি ওই জলের ওপরের অংশ তুলে আচমন করো। কি মনে হচ্ছে?

—লবণাক্ত।

—এবার মধ্যের অংশ নিয়ে আচমন করো। কি মনে হচ্ছে?

—এবারও লবণাক্ত।

—এবার নিচের থেকে খানিকটা জল নিয়ে অচমন করো। কি মনে হচ্ছে?

—একই রকম লবণাক্ত।

আরুণি হেসে বললেন, তুমি ওই লবণকে খুঁজে পাও নি অথচ সেটা এই জলের মধ্যে মিশেছিল। সেরকম আমাদের এই দেহেই স্বয়ং ব্রহ্ম মিশে রয়েছেন। আরো শোনো শ্বেতকেতু, মানুষ যখন দারুণ রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় মৃত্যুপথের যাত্রী হয়, তখন আত্মীয়স্বজনেরা তাকে ঘিরে বসে বলতে থাকে, আমায় চিনতে পারছ? আমায় চিনতে পারছ? কিন্তু সে চিনতে পারে না।

আসলে চিনতে সে ততক্ষণই পারবে, যতক্ষণ তার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় লীন না হয়ে থাকবে। যখনই লীন হবে আর সে কিছু চিনতে পারবে না।

নারদ-সনৎকুমার সংবাদ

একদিন সকালবেলা নারদ এসে সনৎকুমারকে বললেন, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন।

—কেন? সনৎকুমার জানতে চাইলেন।

নারদ উত্তর দিলেন, আমি আপনার কাছে উপদেশ চাই।

—বেশ তো। কিন্তু তার আগে আমার জানা প্রয়োজন, তুমি কি কি জানো?

—আমি যা জানি, সব আপনাকে বলব। কিন্তু আমার একান্ত অভিপ্রায়, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন।

—ঠিক আছে। তুমি যা জানো, তাই নিয়েই আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর। যেটুকু জেনে এসেছো, তার পর থেকে আমি তোমাকে উপদেশ দেব।

সনৎকুমার নারদকে শিষ্যত্বপদে বরণ করে নিলেন। শিষ্যত্ব দেওয়ার পরে সনৎকুমার জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা এবার আমাকে বল তুমি কি কি জেনে এসেছো।

নারদ উত্তর দিলেন, আমি জানি ঋগ্বেদ গুরুদেব।

—আর কি জানো ?

—যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ, পঞ্চমস্থানীয় ইতিহাস পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদিনিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা এবং গন্ধর্বশাস্ত্র।

নারদ বললেন, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন।

—তুমি তো তাহলে অনেক কিছু জানো।

—জানি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এতসব জেনে আমি শুধু

মন্ত্রবিদ্ হয়েছি, আত্মবিদ্ হতে পারি নি।
—আত্মবিদ্ না হলে শোক অতিক্রম করবে কিভাবে?
—আমি জানি গুরুদেব, আত্মবিদ্ না হলে শোক অতিক্রম করা যায় না। একমাত্র আত্মবিদ্ই শোক অতিক্রম করতে পারেন। আমি সেই জ্ঞান অর্জন করতে পারি নি। শোক এখনো আমাকে আপ্লুত করে। আমি আপনার শিষ্য। অনুগ্রহ করে আমাকে শোকের পরপারে নিয়ে যান। সনৎকুমার বললেন, যা কিছু তুমি আয়ত্ত করেছ, সবই নামমাত্র। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে সবই নামমাত্র। তুমি নামের উপাসনা কর।
—একথা কেন বলছেন গুরুদেব?
—নামকে যিনি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করতে পারেন, নামের গতি যতদূর, তাঁরও ততদূর যথেচ্ছ গতি হয়ে থাকে।
নারদ জানতে চাইলেন, আচ্ছা, নামের চাইতে শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কি?
—অবশ্যই আছে।
—সেটি কি আমাকে বলুন।
—নামের চাইতে বাক্ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।
—কেন একথা বলছেন?
—কেননা বর্ণোচ্চারণের কারণ বাগিন্দ্রিয়।
কাজের চাইতে কারণ শ্রেষ্ঠ। জেনে রাখো, ঋগ্বেদকে বিজ্ঞাপিত করে বাক্।

—বাক্ আর কি বিজ্ঞাপিত করে ?

সনৎকুমার উত্তর দিলেন, যজুর্বেদ, সামর্বেদ, চতুর্থবেদ, পঞ্চমবেদ, ইতিহাসপুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব-উৎপাতবিষয়ক বিদ্যা, মহাকালানিধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, ভৌতিকবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র, পৃথিবী, আকাশ, জল, তেজ, সকল দেবতা, মানবজাতি, পশুকুল, যাবতীয় পাখি, যাবতীয় তৃণ ও সমস্ত গাছ, পোকামাকড়, পিঁপড়ে, সমস্ত হিংস্র জন্তুজানোয়ার, পাপপুণ্য, সত্যমিথ্যে, শুভ-অশুভ সব কিছুকে বিজ্ঞাপিত করে বাক্। বাক্ না থাকলে ধর্ম কিংবা অধর্ম কিছুই বিজ্ঞাপিত হতো না। বাক্ সব কিছুকে জানিয়ে দেয়। বাকের গতি যতদূর, তাঁরও ততদূর গমন হয়ে থাকে।

নারদ জিগ্যেস করলেন, বাকের চাইতে শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কি ?

—আছে। অবশ্যই আছে।

—সেটি আমাকে বলুন।

—বাকের চাইতে মন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। বাক্ এবং নামকে বিস্তারিত করে মন। মনই আত্মা, মনই ব্রহ্ম। সুতরাং মনের উপাসনা কর। মনকে যিনি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, মনের গতি যতদূর তাঁর ততদূর গমন হয়ে থাকে।

নারদ জিগ্যেস করলেন, মনের চাইতে শ্রেষ্ঠতর কিছু

আছে কি ?

—নিশ্চয়ই আছে।

—সেটি আমাকে বলুন।

—মনের চাইতে সংকল্প শ্রেষ্ঠ। প্রথমে আমরা সংকল্প করি, তারপর চিন্তা করি এবং বাক্‌কে পরিচালিত ক'রে পথোচ্চারণে প্রবৃত্তি হই। মনে রাখবে, এই সব কিছু চিত্তে লীন হয়। এই সবের উপাদান চিত্ত। চিত্তই এদের প্রতিষ্ঠা। তুমি চিত্তের উপাসনা কর।

নারদ জানতে চাইলেন, চিত্তের চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

—অবশ্যই আছে।

—সেটি আমাকে বলুন।

—চিত্তের চাইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। তুমি জানবে, এ সংসারের সমস্ত কিছু ধ্যানমগ্ন। সব কিছুই ধ্যানস্থ। পৃথিবী ধ্যানমগ্ন, আকাশ ধ্যানমগ্ন, জল ধ্যানমগ্ন, সমস্ত পর্বতমালা ধ্যানমগ্ন, দেবোপম প্রতিটি মানুষ ধ্যানমগ্ন। এই মর-জগতে যাঁরা মহান, মহত্ত্ব যাঁদের সুন্দর করে তুলেছে —তাঁরা সকলেই ধ্যানফলের অংশভোগী। ক্ষুদ্র যারা, হীনচেতা যারা, যারা সদাসর্বদা বিবাদ কলহ করতে ভালোবাসে, সর্বদা যারা পরের দোষ খুঁজে বেড়ায়, যারা নিন্দুক এবং পরশ্রীকাতর—ধ্যানফল তাদের স্পর্শ করে না। তুমি ধ্যানের উপাসনা কর। ব্রহ্মরূপে ধ্যানের

উপাসনা কর

নারদ জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা গুরুদেব, ধ্যানের চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?

—অবশ্যই আছে।

—সেটি আমাকে বলুন।

—ধ্যানের চাইতে বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

—একথা কেন বলছেন?

—কেননা বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা ঋগ্বেদ বুঝতে পারি। যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদিনিধি বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, ভৌতিকশাস্ত্র, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্ব-শাস্ত্র, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, সমস্ত দেবতা, মানবজাতি, পশু-পাখি, তৃণ ও সকল বৃক্ষ পোকামাকড় পিপঁড়ে সহ যাবতীয় হিংস্র জানোয়ার পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, শুভ-অশুভ, সুন্দর-অসুন্দর, স্বাদ-বিস্বাদ, ইহলোক-পরলোক, এই সব কিছু বিজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়, উপলব্ধি করা যায়। তুমি বিজ্ঞানের উপাসনা কর, ব্রহ্মরূপে বিজ্ঞানের উপাসনা কর।

নারদ জিগ্যেস করলেন, বিজ্ঞানের চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?

—অবশ্যই আছে।

—সেটি আমাকে বলুন।

—বিজ্ঞানের চাইতে বল অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। একজন বলবান মানুষকে একশত বিজ্ঞানবিদ ভয় পান। বলের দ্বারা পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। তুমি ব্রহ্মরূপে বলের উপাসনা কর। এবার নারদ জিগ্যেস করলেন, বলের চাইতে অন্ন শ্রেষ্ঠ। কেননা তুমি দেখবে দশ দিন কেউ যদি ভালো খাদ্য গ্রহণ না করে—সেক্ষেত্রে বেঁচে থাকলেও সে দৃষ্টিহীন, বোধহীন হয়ে পড়ে। তার চিন্তাশক্তি কাজ হবে না, সে ভালো করে কানে শুনতে পারে না। বিজ্ঞান তার কাজে আসে না। অতএব অন্নের উপাসনা কর। ব্রহ্মরূপে অন্নের উপাসনা কর।

নারদ জিজ্ঞেস করলেন, অন্নের চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?

—অবশ্যই আছে।

—সেটি আমাকে বলুন।

—অন্নের চাইতে জল শ্রেষ্ঠ। তুমি দেখবে, বৃষ্টি ভালো না হলে অন্ন অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হবে—এই ভয়ে সমস্ত জীব কাতর হয়ে পড়ে। আবার বৃষ্টি ভাল হলে অন্ন প্রচুর পরিমাণে হবে—এই ভেবে সকলে উল্লসিত হয়ে ওঠে। যা কিছু তুমি, চোখের সামনে দেখছ এই পৃথিবী এই আকাশ, এই সব পর্বত, দেবোপম এই সব মানুষ, এই পশুকুল, পোকামাকড়, তৃণ ও সমস্ত বৃক্ষ—জলের দ্বারা

এরা মূর্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং তুমি ব্রহ্মরূপে জলের উপাসনা কর।

নারদ জিগ্যেস করলেন, জলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি গুরুদেব?

—আছে।

—সেটি তাহলে আমাকে বলুন।

—জলের চাইতে তেজ শ্রেষ্ঠ। বায়ুকে আশ্রয় করে তেজ যখন আকাশকে তপ্ত করে তোলে, আমাদের গরম লাগে। উত্তাপে আমরা অস্থির হয়ে উঠি। তেজ নিজেকে আগে প্রকাশ করে। তারপরে জল সৃষ্টি করে। তুমি ব্রহ্মরূপে তেজের উপাসনা কর। যিনি তেজকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী হয়ে ওঠেন। তেজের গণ্ডি যতদূর, তাঁরও ততদূর স্বচ্ছন্দ গতি হয়।

নারদ জানতে চাইলেন, তেজের চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?

সনৎকুমার উত্তর দিলেন, আছে।

—তাহলে সেটি আমাকে বলুন।

—তেজের চাইতে আকাশ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।

—এর কারণ কি?

—কারণ, সূর্য চন্দ্র বিদ্যুৎ যাবতীয় নক্ষত্র অগ্নি আকাশেই আশ্রয় পেয়েছে। আরো আছে।

—আর কি আছে?

—আকাশের সাহায্যে আহ্বান, আকাশের সাহায্যে শ্রবণ এবং প্রতিশ্রবণ, আকাশেই প্রিয়জনের বিয়োগজনিত শোক। এক কথায় আকাশেই সব। আকাশেই সমস্ত। আকাশকে কেউ ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে তিনি জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠেন। তাঁর মনের গতি বিস্তৃত হয়। তুমি আকাশের উপাসনা কর।

নারদ জিগ্যেস করলেন, আকাশের চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?

—আছে।

—এবার সেটি আমাকে বলুন।

—আকাশের চাইতে স্মৃতি শ্রেষ্ঠ। স্মরণ না থাকলে শ্রবণ কিংবা মনন কোনোটারই অস্তিত্ব থাকে না। স্মৃতিই সব। তুমি স্মৃতির উপাসনা কর, ব্রহ্মরূপে যদি কেউ স্মৃতির উপাসনা করতে পারেন, তাহলে স্মৃতির গতি যতদূর তাঁরও ততদূর স্বচ্ছন্দ গতি হয়।

নারদ প্রশ্ন করলেন, স্মৃতির চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?

—আছে।

—এবার সেটি আমাকে বলুন।

—স্মৃতির চাইতে আশা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। কেননা আশাই মানুষকে উদ্দীপনা দেয়, উৎসাহ দেয়, অনুপ্রাণিত করে। আশার প্রভাবে মানুষ মন্ত্র পাঠ করে, সমস্ত শুভকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়।

—আমি কি তাহলে আশার উপাসনা করব ?
—হ্যাঁ। তুমি ব্রহ্মরূপে আশার উপাসনা কর।
—এতে কি ফল হবে ?
—আশাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হবে। তোমার সকল প্রার্থনা অমোঘ হবে।
নারদ জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা গুরুদেব, আশার চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?
—আছে।
—সেটি তাহলে আমাকে বলুন।
—আশার চাইতে প্রাণ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।
—কেন ?
—কেননা প্রাণেই সবকিছু প্রবিষ্ট রয়েছে।
—বিষয়টা আরেকটু বিশদ করুন।
—মনে রাখবে, প্রাণই প্রাণ দান করে।
—কিরকম ?
—প্রাণ পিতা, প্রাণ মাতা, প্রাণ স্বামী, প্রাণ ভ্রাতা, প্রাণ ভগ্নী, প্রাণ আচার্য, প্রাণই ব্রাহ্মণ। প্রাণ স্বয়ং এই সমস্ত হয়েছেন। মনে রেখো নারদ, একজন প্রাণবিদ্ এভাবে দর্শন করেন, এভাবে মনন করেন, গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন।
নারদ জানতে চাইলেন, এভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার পরে তিনি কি হয়ে ওঠেন ?

সনৎকুমার উত্তর দিলেন, এভাবে বিচার করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনি অতিবাদী হয়ে ওঠেন।

—এর অর্থ সেই অবস্থায় কেউ যদি তাঁকে অতিবাদী বলেন, তিনি তাহলে অস্বীকার করবেন না ?

—না। সেই অবস্থায় কেউ তাঁকে অতিবাদী বললে তিনি অস্বীকার করবেন না। কেননা তিনি সর্বেশ্বর প্রাণীকে জেনেছেন। সুতরাং কেন তিনি সত্য গোপন করবেন ?

নারদ বললেন, তার মানে সত্যকে আশ্রয় করে যিনি অতিবাদী হয়ে ওঠেন, তিনিই যথার্থ অতিবাদী। এই তো ?

সনৎকুমার হেসে বললেন, ঠিক ধরেছ। সত্যকে আশ্রয় করে যিনি অতিবাদী হয়ে ওঠেন, তিনিই যথার্থ অতিবাদী। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, সত্যকে বিশেষ ভাবে জানার জন্য, সত্যের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য তোমাকে কৌতূহলী হতে হবে, বিশেষভাবে উৎসুক হতে হবে।

নারদ ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, গুরুদেব, আমি সত্যকে বিশেষভাবে জানতে চাই।

সনৎকুমার উত্তর দিলেন, বিশেষভাবে না জেনে কেউ সত্য বলতে পারেন না। এই বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান সম্পর্কে তীব্র অনুসন্ধিৎসা অবশ্যই প্রয়োজন।

নারদ বললেন, আমি বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে জানতে

চাই। এর জন্য কি করতে হবে, বলুন।
সনৎকুমার হাসিমুখে বললেন, মনন করলে তবেই তুমি বিজ্ঞানকে পাবে। মনন ছাড়া বিজ্ঞান লাভ অসম্ভব।
—অর্থাৎ মননকে জানার জন্য আমাকে গভীরভাবে উৎসুক হতে হবে।
—ঠিক বলেছো। মননকে জানার জন্য গভীরভাবে উৎসুক হয়ে উঠতে হবে।
—আমি মননকে জানতে চাই।
সনৎকুমার বললেন, মনে রেখো, মনন হচ্ছে শ্রদ্ধাসাপেক্ষ। শ্রদ্ধাবান না হলে মনন করা যায় না। সুতরাং শ্রদ্ধাকে জানার জন্য তোমাকে উৎসুক হতে হবে।
নারদ বলে উঠলেন, গুরুদেব, আমি শ্রদ্ধাকে জানতে চাই।
সনৎকুমার উত্তর দিলেন, শ্রদ্ধা কিন্তু নিষ্ঠাসাপেক্ষ।
—তার মানে শ্রদ্ধাকে জানতে হলে নিষ্ঠাবান হতে হবে?
—হ্যাঁ। নিষ্ঠাবান না হলে তুমি শ্রদ্ধাকে জানতে পারবে না।
নারদ বললেন, আমি তাহলে নিষ্ঠাবান হয়ে উঠব।
—তুমি কি নিষ্ঠাকে জানতে চাও?
—হ্যাঁ।
—কিন্তু মনে রেখো, নিষ্ঠা হচ্ছে একাগ্রতাসাপেক্ষ। একাগ্র না হয়ে নিষ্ঠাবান হওয়া যায় না। অতএব তুমি একাগ্রতাকে জানার চেষ্টা কর।

নারদ বললেন, আমি একাগ্র হব। একাগ্রতাকে জানব। সনৎকুমার বললেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু একাগ্রতা হচ্ছে সুখসাপেক্ষ। তোমাকে সেই বিশেষ সুখ জানতে হবে।

—আমি সেই বিশেষ সুখকেই জানতে চাই। আমাকে সেই সম্পর্কে বলুন।

সনৎকুমার উত্তর দিলেন, মনে রেখো নারদ, ভূমাই সেই বিশেষ সুখ।

—ভূমা কি?

—ভূমা অর্থাৎ সেই সর্বব্যাপী পুরুষ, সেই বিরাট। প্রকৃত সুখ তিনিই। তুমি সেই পুরুষকে জানার চেষ্টা কর।

—আমি সেই পুরুষ অর্থাৎ ভূমাকে জানতে চাই।

—তার আগে তোমাকে ভূমার সংজ্ঞা জানতে হবে।

—কি সেই সংজ্ঞা আমাকে বলুন।

—যাঁর মধ্যে কেউ আর কিছু দ্যাখে না, আর কিছু শোনে না, আর কিছু জানে না, তিনিই ভূমা। তিনিই সেই সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষ। তিনি ভূমা, তিনি অমৃত।

নারদ জিগ্যেস করলেন, সেই পুরুষ কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

সনৎকুমার বললেন, সদাসর্বদা তিনি স্বমহিমা কিংবা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

—আর আমি যদি তাঁকে পরামর্শরূপে বুঝতে চাই? তাহলে?

—তাহলে জানবে তিনি নিরালম্ব এবং অপ্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে মনে রেখো, প্রতিষ্ঠার অর্থ এ ক্ষেত্রে ভিন্ন।

এই মরজগতে প্রতিষ্ঠা বলতে লোকে বোঝে, ধনদৌলত, বিত্তসম্পত্তি ইত্যাদি। আমি সে প্রতিষ্ঠার জন্য বলছি না। আমার বক্তব্য, তাঁর মহিমা অন্য ধরনের। তাঁর প্রতিষ্ঠা কিংবা অপ্রতিষ্ঠার চেহারা অন্যরকম, স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোথাও প্রতিষ্ঠিত নন। তিনি রয়েছেন নিচে, তিনি ওপরে, তিনি পেছনে, তিনি সামনে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনিই সব, তিনিই সমস্ত। আবার আত্মা সম্পর্কে এইভাবে বলা যায়, আত্মা নিচে, আত্মা ওপরে, আত্মা সামনে, আত্মা উত্তরে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা সব। আত্মা সমস্ত।

—এইভাবে দর্শন করলে কি হয়?

—এইভাবে যিনি দর্শন করেন, এইভাবে যিনি মনন করেন, এইভাবে যিনি বিচার বিশ্লেষণ করেন, সমস্ত লোকে তাঁর অপ্রতিহত গতি হয়। মনে রেখো নারদ, আত্মা থেকে প্রাণ, আত্মা থেকে আশা, আত্মা থেকে স্মৃতি, আত্মা থেকে আকাশ, আত্মা থেকে তেজ, আত্মা থেকে জল, আত্মা থেকে আবির্ভাব, আত্মা থেকে তিরোভাব, আত্মা থেকে অন্ন, আত্মা থেকে বুদ্ধি, আত্মা থেকে বিজ্ঞান, আত্মা থেকে ধ্যান, আত্মা থেকে চিত্ত, আত্মা থেকে সংকল্প, আত্মা থেকে মন, আত্মা থেকে বাক্, আত্মা থেকে নাম, আত্মা থেকে যাবতীয় মন্ত্র, আত্মা থেকে সমস্ত কর্ম, আত্মা থেকেই সব কিছু হয়ে থাকে।

ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদ

একবার প্রজাপতি বলেছিলেন, যে আত্মা নিষ্পাপ, যে জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন, সত্যহীন এবং সত্যসংকল্প, তাঁরই অনুসন্ধান সকলের করা উচিত। আত্মার এই পরিচয় লাভ করে সেই ভাবে এঁকে যিনি বিশেষ ভাবে অনুভব করতে পারেন, সমস্ত লোকে তাঁর যথেচ্ছ গতি হয় এবং যাবতীয় কাম্য বিষয় তিনি পেয়ে থাকেন।

প্রজাপতির এই বাণী দেবতা ও অসুরদের কানে গেল। দেবরাজ ইন্দ্র তার সঙ্গী দেবতাদের বললেন, আমি ভাবছি প্রজাপতি বর্ণিত এই আত্মার অনুসন্ধান করব। এ বিষয়ে তোমরা কি বল ?

দেবতারা বলে উঠলেন, এতো খুব ভাল কথা।

আপনি যদি সেই আত্মার প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে দেবলোকের সকলেই সবিশেষ উপকৃত

হবেন। আমরাও চাই আপনি সেই আত্মার অনুসন্ধান করুন। প্রকৃত জ্ঞানের আলো আপনাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলুক।

দেবতাদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপতির সঙ্গে দেখা করার জন্যে রওনা হলেন।

ওদিকে অসুররাজ বিরোচনের কানেও প্রজাপতির সেই বাণী পৌঁছেছিল। তিনিও তাঁর সতীর্থ অসুরদের ডেকে বললেন, প্রজাপতির বাণী শুনেছো তো? তিনি যে

আত্মার কথা বলেছেন, আমি ভাবছি, তাঁর অনুসন্ধান করব। তাঁর পরিচয় লাভ করব। তোমরা কি বল?

বিরোচনের কথা শুনে উপস্থিত সব অসুর খুবই খুশি হলো। প্রসন্নমনে তারা বিরোচনকে উৎসাহ দিয়ে বলল, আপনি সেই আত্মার অনুসন্ধানে যান মহারাজ। আমরা এদিকটা সব সামলে নেব। আপনি সেই আত্মার প্রকৃত পরিচয় জেনে আসুন। আপনার অর্জিত আত্মজ্ঞান ভবিষ্যতে সমস্ত অসুরকে উদ্বুদ্ধ করবে। আমরা সকলেই উপকৃত হব।

অসুরদের কাছে উৎসাহ পেয়ে বিরোচন প্রজাপতির

সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হলেন।

বিরোচন জানতেন না, ইন্দ্রও এই একই উদ্দেশ্যে প্রজাপতির কাছে এসেছেন। ঠিক সেই রকম বিরোচনের আগমনের হেতুও ইন্দ্রের কাছে অজানা ছিল।

অথচ প্রজাপতির কাছে দুজনে প্রায় একই সময়ে উপস্থিত হলেন। বলা বাহুল্য, দুজনেই দুজনকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। যদিও কেউই সে-কথা প্রকাশ করলেন না।

যাই হোক, প্রজাপতি দুজনকেই জিগ্যেস করলেন, কি ব্যাপার! আমার কাছে তোমরা কেন এসেছ?

দুজনেই উত্তর দিলেন, আমরা আপনার বর্ণিত আত্মার স্বরূপ জানতে চাই।

—তোমরা নিশ্চয়ই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ। এখন তোমাদের দুজনকেই এখানে বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য বাস করতে হবে। রাজি আছো?

—আমরা রাজি।

—ঠিক আছে।

দুজনেই সেখানে বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য বাস করলেন।

বত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে একদিন প্রজাপতি তাদের ডেকে বললেন, এখন বল তো কেন তোমরা এখানে বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য বাস করলে?

দুজনেই উত্তর দিলেন, যে আত্মা নিষ্পাপ, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, তাঁরই অনুসন্ধান করার জন্য, তাঁকেই জানার জন্য আমরা এখানে বসবাস করেছি।

—বেশ। প্রজাপতি বললেন, তাহলে শোনো, চক্ষুতে যে পুরুষ দেখছ, ইনিই আত্মা। ইনি অমৃত। ইনি অভয়। ইনি ব্রহ্ম।

বিরোচন জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা এই যিনি জলে এবং আয়নায় ছায়া দেন, তিনি কে?

প্রজাপতি উত্তর দিলেন, তিনিই আত্মা, জলপূর্ণ একটি পাত্র নিয়ে এসো।

দু-জনে গিয়ে জলপূর্ণ পাত্র নিয়ে এলেন। প্রজাপতি বললেন, এবার এই জলপূর্ণ পাত্রের দিকে তাকাও।

দু-জনে সেদিকে তাকালেন।

প্রজাপতি বললেন, ওই জলের মধ্যে নিজেকে দেখে আত্মা সম্পর্কে যা বুঝতে পারবে না, আমাকে জিগ্যেস করো।

ইন্দ্র ও বিরোচন দুজনেই জলের দিকে তাকালেন।

প্রজাপতি জিগ্যেস করলেন, কি দেখছ?

দু-জনে উত্তর দিলেন, আমরা সামগ্রিকভাবে আত্মাকেই দেখছি।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা বেশ, এবারে স্নান করে এসো। দু-জনে স্নান করে এলেন।

প্রজাপতি বললেন, ভালো পোষাক পরে এসো।

দু-জনে তাই করলেন।

প্রজাপতি বললেন, এবার ওই জলের দিকে তাকাও। দু-জনে তাকালেন।

প্রজাপতি বললেন, কি দেখছ?

দু-জনেই উত্তর দিলেন, আমরা যেমন সুন্দর পোষাক এবং সুন্দর অলংকার পরে রয়েছি, আমাদের ছাড়াও ওরা ঠিক সেই রকম সুন্দর পোষাক এবং মনোহর অলংকার প'রে রয়েছে।

প্রজাপতি হেসে বললেন, ইনিই আত্মা। ইনি ব্রহ্ম, ইনি অমৃত এবং অভয়। তোমরা খুশি তো? যা জানতে চেয়েছিলে, জেনে গেলে?

—তাহলে আমরা আসি?

—এসো।

দুজনে তৃপ্ত হয়ে ফিরে চললেন। আসলে প্রজাপতি

এঁদের ভ্রম দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুজনের চিত্তই অশুদ্ধ। তাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কিছুই ধারণা করতে পারলেন না। ধরেই নিলেন, প্রাথমিকভাবে যা জেনেছি, সেটুকুই আত্মার পরিচয়। প্রজাপতিও চুপ করে ছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, আত্মার স্বরূপ জানার জন্য আবার ব্রহ্মচর্য পালন করতে এঁরা অযথা মনে কষ্ট পাবে। অথচ প্রজাপতি এটাও জানতেন, দেবতা কিংবা অসুর যে-কেউ আত্মা সম্পর্কে এই প্রাথমিক উপনিষৎ গ্রহণ করলে জীবনে পরাভূত হবে। ব্যর্থ হবে।

অসুররাজ বিরোচন হাল্‌কা মনে অসুরদের কাছে গিয়ে এই উপনিষৎ বললেন। বিরোচনের কথা অনুযায়ী অসুররা জানল, এই জগতে দেহেরই পূজা করা উচিত। বিরোচনের কাছে দেহই আত্মা। বিরোচনের এই ভুল প্রচারের জন্য দানহীন, শ্রদ্ধাহীন এবং যজ্ঞহীন, মানুষকে লোকে বলে অসুরস্বভাব। বিরোচনের এই মতবাদ আসুরী উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ।

এদিকে ইন্দ্র কিন্তু দেবতাদের কাছে ফিরে গেলেন না। একটা নদীর ধারে বসে তিনি পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করলেন। নদীর জলে আবার নিজেকে দেখলেন। নিজের ছায়াকে আত্মা বলে মেনে নিতে তাঁর খুবই অসুবিধে হলো। তিনি ভাবলেন, ছায়াকে আমি কিভাবে

আত্মা বলব? এ তো নিছক দেহের ছায়া। দেহ যদি চমৎকারভাবে অলংকৃত হয়, ছায়াও হবে। দেহ যদি সুন্দর পোষাক পরে, ছায়ার ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে। দেহ পরিষ্কার থাকলে ছায়াও পরিষ্কার থাকবে। দেহ অপরিষ্কার নোংরা থাকলে ছায়াও অপরিষ্কার নোংরা থাকবে। দেহ অন্ধ হয়ে গেলে ছায়াও অন্ধ হয়ে যাবে। দেহ অঙ্গহীন হলে ছায়ার অঙ্গহীন হবে। আর সবচাইতে বড় কথা, দেহের বিনাশ ঘটলে ছায়ারও বিনাশ ঘটবে। ছায়াও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে ছায়াকে আমি আত্মা বলব কেন? ছায়াদেহ তো নশ্বর। নশ্বর বিষয় কিভাবে আত্মা হতে পারে? এইসব চিন্তা করে ইন্দ্র আবার প্রজাপতির কাছে ফিরে এলেন।

প্রজাপতি হাসতে হাসতে বললেন, কি ব্যাপার, তুমি আবার ফিরে এলে যে?

—আমি একটা সমস্যায় পড়েছি।

—কিসের সমস্যা?

—আসলে একটা সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

—আবার কি সংশয় উপস্থিত হলো? এই না তুমি একটু আগে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেলে? তখন তো কোনো সংশয় দেখি নি।

—আত্মার ব্যাপারেই আমার সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

—সেটা কি, শুনি।

—আমি তখন ছায়াকেই আত্মা জেনে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে আমি চিন্তা করে দেখলাম……

—কি চিন্তা করে দেখলে ?

—চিন্তা করে দেখলাম, ছায়া কখনোই আত্মা হতে পারে না। এই ছায়াত্মার জ্ঞানে আমি কোনো ইষ্টফল দেখছি না।

—তাহলে ?

—আমার মনে হচ্ছে, ছায়া অনাত্মা।

—কেন এরকম মনে হচ্ছে ?

—কেননা ছায়াদেহ নশ্বর।

—চিন্তা করে বলছ তো ?

—হ্যাঁ। চিন্তা করেই বলছি।

—প্রজাপতি প্রসন্নমুখে বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছ। আত্মা বিষয়টি আমি তোমার কাছে আবার ব্যাখ্যা করব। আরো বত্রিশ বছর তুমি এখানে বসবাস কর।

—তাই করছি। আরো বত্রিশ বছর ইন্দ্র সেখানে বসবাস করলেন।

বত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে প্রজাপতি একদিন তাঁকে বললেন, শোনো দেবরাজ, এই যে স্বপ্নে যিনি পূজনীয়

হয়ে বিচরণ করেন, তিনি আত্মা। এই আত্মা অদ্ভুত এবং অভয়। ইনি ব্রহ্ম।

—বুঝতে পেরেছি।

—ঠিক বুঝেছো তো ?

—হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি। খুশি মনে ইন্দ্র ফিরে চললেন। যাওয়ার সময় ভাবলেন, যাক্ এবার আমি আত্মার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আর কোনো সংশয় আমার রইল না। কিন্তু দেবলোকে পৌঁছোবার আগেই তাঁর মনে হলো, এই শরীর অন্ধ হলেও স্বপ্নাত্মা অন্ধ হবেন না। দেহ পঙ্গু হলেও তিনি পঙ্গু হবেন না। দেহ হত হলেও তিনি হত হবেন না। তবু আমার মনে হচ্ছে, কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারে, বিতাড়িত করতে পারে। এঁর সুখ- দুঃখ বোধ আছে। আমি তো এঁকে ব্রহ্ম মনে করতে পারব না। এঁকে অমৃত অভয় মনে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

এই সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে ইন্দ্র আবার প্রজাপতির কাছে ফিরে এলেন। প্রজাপতি একটু আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন, কি ব্যাপার ইন্দ্র, আবার যে তুমি ফিরে এলে ?

—আমি আবার সমস্যায় পড়েছি।

—আবার কিসের সমস্যা হলো ? এই না তুমি সব জেনে প্রসন্ন মনে ফিরে গিয়েছিলে ?

ইন্দ্র উত্তর দিলেন, তখন আমি প্রসন্ন হয়েছিলাম বটে

কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ভুল হয়েছিল।

—কোথায় ভুল হয়েছিল ?

—আমি জানি দেহ অন্ধ হলেও স্বপ্নাত্মা অন্ধ হন না, দেহের কোনো দোষ এঁকে স্পর্শ করে না, দেহের সুখ-দুঃখ বোধের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই তবু আমার মনে হচ্ছে, চেষ্টা করলে এই স্বপ্নাত্মাকে বধ করা যায়, একে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। মনে হচ্ছে এঁরও যেন সুখ-দুঃখ বোধ আছে, অপ্রিয় বিষয় এঁকেও স্পর্শ করে। এতে আমি কোনো মঙ্গল দেখছি না।

প্রজাপতি বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছ। আত্মার ব্যাখ্যা আমি তোমার কাছে আবার করব। তুমি আরো বত্রিশ বছর এখানে বসবাস করো।

আরো বত্রিশ বছর সেখানে ব্রহ্মচর্য পালন করার পরে প্রজাপতি তাঁকে বললেন, শোনো দেবরাজ, যিনি ঘুমন্ত থেকেও সমস্ত স্বপ্নদর্শন থেকে বিরত থাকেন, তিনিই আত্মা। তিনিই ব্রহ্ম।

—ঠিক আছে। খুশী হয়েই ইন্দ্র ফিরে চললেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তাঁর চিন্তা হলো, ঘুমন্ত পুরুষ কিভাবে

সমস্ত প্রাণীকে জানবেন? নিজেকে জানাই তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব আমি কেন এঁকে ব্রহ্ম মনে করব।

আবার তিনি প্রজাপতির কাছে ফিরে এলেন। প্রজাপতি হাসতে-হাসতে বললেন, আরে কি আশ্চর্য, তুমি তো নিশ্চিন্তে চলে গিয়েছিলে। আবার ফিরে এলে কেন?

ইন্দ্র আবার তাঁর নতুন সংশয়ের কথা খুলে বললেন। প্রজাপতি উত্তর দিলেন, ন্যায্য কারণেই তোমার সংশয় উপস্থিত হয়েছে। তুমি আরো পাঁচ বৎসর এখানে বসবাস করো।

আরো পাঁচ বৎসর ইন্দ্র সেখানে থেকে গেলেন। এই নিয়ে প্রজাপতির কাছে মোট একশো-এক তিনি বসবাস করলেন।

আত্মার স্বরূপ জানার জন্যে এই দীর্ঘকাল তাঁকে গুরুগৃহে বাস করতে হয়েছিল।

পাঁচ বৎসর পরে প্রজাপতি বললেন, শোনো দেবরাজ, আমাদের এই শরীর মরণশীল। মৃত্যু একে বিনষ্ট করে আবার এই শরীরেই অমর অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান। শরীর থাকলেই সুখ-দুঃখের বোধ থাকবে। কিন্তু যিনি অশরীর, সুখ-দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করে না। তুমি তো জানো ইন্দ্র, বায়ুর কোনো শরীর নেই। বিদ্যুতের কোনো শরীর নেই। মেঘগর্জনের কোনো শরীর নেই।

ঠিক সেই রকম অমর আত্মার কোনো শরীর নেই। তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনিই জ্ঞানস্বরূপ। তাঁকে সমস্ত দেবতা উপাসনা করেন।

উদ্‌গীথ মন্ত্র

পুরাকালে দেবতা এবং অসুরেরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করছিলেন তখন অসুরদের পরাজিত করার জন্য দেবতারা উদ্‌গীথ মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন।

দেবতারা নাসিকায় অবস্থানরত প্রাণ দেবতাকে উদ্‌গীথ কর্তা হিসেবে পূজা করেছিলেন। তাঁকে অসুরেরা পাপবিদ্ধ করেছিল। পাপের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার দরুন লোকে সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ দুটোই পেয়ে থাকে।

দেবতারা বাগ্‌-দেবতাকে উদ্‌গীথ কর্তা রূপে উপাসনা করেছিলেন। অসুরেরা তাঁকে পাপবিদ্ধ করার দরুন লোকে সত্যি কথা মিথ্যে কথা দুটোই বলে থাকে।

দেবতারা চক্ষু দেবতাকে উদ্‌গীথ কর্তারূপে অর্চনা করেছিলেন। তাঁকে অসুরেরা পাপবিদ্ধ করার দরুন লোকে সুদৃশ্য এবং কুদৃশ্য দুটোই দেখে থাকে।

দেবতারা কর্ণ দেবতাকে উদ্‌গীথ কর্তা ভেবে আরাধনা

করেছিলেন। অসুরেরা তাঁকে পাপবিদ্ধ করার দরুন লোকে প্রিয় এবং অপ্রিয় দু-রকম কথাই শোনে।

দেবতারা মনোদেবতাকে উদ্‌গীথ কর্তা ভেবে উপাসনা করেছিলেন। অসুরেরা তাঁকে পাপবিদ্ধ করার দরুন লোকে শুভ এবং অশুভ দুই রকম চিন্তাই করে থাকে।

দেবতারা মুখ্য প্রাণকে উদ্‌গাতা ভেবে উপাসনা করেছিলেন কিন্তু অসুরেরা এঁকে পাপবিদ্ধ করতে পারে নি বরং এঁর সংস্পর্শে আসা মাত্রই তারা ধ্বংস হয়ে গেল। মুখ্য প্রাণের চরিত্রই এই রকম। প্রাণবিদের প্রতি কেউ যদি অন্যায় ব্যবহার করে কিংবা হিংসে করে সে শোচনীয় ভাবে পরাভূত হয়। মুখ্যপ্রাণ অপাপবিদ্ধ।

প্রবাহন-জৈবলির উপাখ্যান

শলাবতের পুত্র শিলক, দল্‌ভ্য গোত্রে চৈকিতায়ন এবং জীবলপুত্র প্রবাহন—এই তিনজন প্রাচীনকালে উদ্‌গীথ জ্ঞানে পারদর্শী হয়েছিলেন। তারপর তাঁরা উদ্‌গীথ বিষয়ে বিচার করতে প্রবৃত্ত হলেন।

প্রথমে শিলক চৈকিতায়নকে বললেন, আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি। বলুন তো সামের আশ্রয় কি?

চৈকিতায়ন উত্তর দিলেন, স্বর।

—স্বরের আশ্রয় কি?

—প্রাণ।

—প্রাণের আশ্রয় কি?

—অন্ন।

—অন্নের আশ্রয় কি?

—জল।

—জলের আশ্রয় কি?

—স্বর্গলোক।
—স্বর্গলোকের আশ্রয় কি ?
—স্বর্গের কোনো আশ্রয় নেই। স্বর্গলোকই সামবেদ।
তখন শিলক চৈকিতায়নকে বললেন, আপনার সাম অপ্রতিষ্ঠিতই থেকে গেল।
চৈকিতায়ন হেসে বললেন, তাহলে আপনি আমাকে উত্তরটা জানিয়ে দিন।
শিলক উত্তর দিলেন, স্বর্গলোকের আশ্রয় এই পৃথিবীলোক।
চৈকিতায়ন বললেন, এই পৃথিবীর আশ্রয় কি ?
শিলক উত্তর দিলেন, সাম এই পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত।
তখন প্রবাহন জৈবলি শিলককে বললেন, প্রিয় শালাবত্য, আপনার সাম কিন্তু অনন্ত নয়।
শিলক বললেন, তাহলে আপনি আমাকে সঠিক উত্তর জানিয়ে দিন।
জৈবলি উত্তর দিলেন, এই পৃথিবীর আশ্রয় আকাশ। সমস্ত কিছু আকাশ থেকেই উৎপন্ন এবং আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়। আকাশই পরম প্রতিষ্ঠা। আকাশ অর্থাৎ পরমাত্মা।

উষস্তির গল্প

একবার কুরুদেশে শিলাবৃষ্টিতে সব ফসল বিনষ্ট হয়ে গেলে উষস্তি চাক্রায়ণ তাঁর নাবালিকা পত্নীকে নিয়ে মাহুতদের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

উষস্তির অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়।

জীবিকা নির্বাহের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে রয়েছেন। একেবারে দিশেহারা পরিস্থিতি।

সেইসময় একদিন তার চোখে পড়ল, একটি মাহুত অখাদ্য মাষ খাচ্ছে। ওরকম একটি কুখাদ্য লোকটিকে গ্রহণ করতে দেখে ঐ উষস্তির মনে হলো, এরাও খুব গরীব। যাই হোক, সে-সব চিন্তা করারও মনের অবস্থা তাঁর তখন ছিল না। ক্ষিদের যন্ত্রণায় তিনি তখন চোখে অন্ধকার দেখছেন।

বাধ্য হয়ে ক্ষিদে মেটানোর জন্য তিনি লোকটির কাছে

সেই কদর্য মাষ ভিক্ষে চাইলেন।

লোকটি বলল, আমি আপনাকে কিভাবে ভিক্ষে দেব? আর তো কিছু আমার কাছে নেই।

—অতিরিক্ত আর কোনো মাষ নেই?

—না। এই যে দেখছেন পাত্রে যেটুকু আছে, এর চাইতে বেশি একটি দানাও নেই।

—ঠিক আছে। ওইগুলিই আমাকে দাও।

—কিন্তু এসব যে আমার এঁটো। আমার উচ্ছিষ্ট।

—তা হোক। তবু তো ওগুলো দিয়ে আমার এখনকার ক্ষিদে কিছুটা মিটবে।

—বেশ। নিন। পাত্রের অবশিষ্ট মাষ তাঁকে দিয়ে মাহুত বলল, জল আছে। জল দিয়ে খান।

—ও জল আমি খাব কিভাবে? ও তো তোমার এঁটো জল।

—আমার এঁটো জলে আপত্তি করছেন! অথচ এক্ষুনি আমার এঁটো মাষ খেলেন।

উষস্তি বললেন, ওগুলো না খেলে আমি বাঁচতাম না। কিন্তু পানীয় জল আমি ইচ্ছেমতো পেতে পারি।

আসলে উষস্তি বলতে চেয়েছেন, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবন-ধারণের জন্য ঠিক যতটুকু নিষিদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজন, তিনি ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করবেন, তার বেশি নয়। এক্ষেত্রে মাহুত লোকটির উচ্ছিষ্ট মাষ তিনি গ্রহণ করলেন

জীবনধারণের জন্য, কিন্তু তার উচ্ছিষ্ট জল গ্রহণ না করলেও তাঁর চলে যাবে, তাঁর বেঁচে থাকতে অসুবিধে হবে না।

খাওয়া শেষ করে, অবশিষ্ট মাষগুলি উষস্তি স্ত্রীর জন্য নিয়ে এলেন।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে স্ত্রীকে বললেন, আজ এখানকার রাজা যজ্ঞ করবেন। আমাকে তিনি

ঋত্বিক পদে বরণ করে নিতেন। অথচ আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। ওই যজ্ঞে যেতে পারলে আমাদের কিছু ধনলাভ হতো। কিন্তু আমি যেতে পারছি না।

—একথা কেন বলছ, স্ত্রী ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করলেন।

—কেমন করে যাব? সেখানে তো আমি না খেয়ে যেতে পারব না। গেলে কিছু খেয়ে যেতে হবে।

স্ত্রী বললেন, এমনিতে তো ঘরে খাদ্য কিছু নেই। শুধু গতকাল ভিক্ষে করে আনা সেই কদর্য মাষ রয়েছে।

—কি আর করা যাবে। ওগুলিই দাও। খেয়ে চলে যাই।

সেই কদর্য মাষ খেয়েই উষস্তি যজ্ঞক্ষেত্রে গেলেন।

যজ্ঞভূমিতে তখন সকলে এসে গেছেন। উষস্তি সেই যজ্ঞের প্রস্তাবপাঠককে উদ্দেশ্য করে বললেন, শোনো প্রস্তাব-পাঠক, প্রস্তাবে যে দেবতা রয়েছেন, তাঁকে না জেনে তুমি যদি প্রস্তাবপাঠ কর, তোমার মুণ্ডপাত হবে।

এক্ষেত্রে উষস্তি বলতে চেয়েছেন, যিনি কর্ম জানেন, অথচ কর্মজ্ঞান যাঁর অজ্ঞাত। তিনি যদি কর্মজ্ঞানীর সামনে বিনা অনুমতিতে কর্মে লিপ্ত হন, তাঁর দুর্দশার অন্ত থাকবে না।

এরপর উষস্তি যজ্ঞের উদ্‌গাতাকে বললেন, শোনো উদ্‌গাতা, উদ্‌গীথে যে দেবতা রয়েছেন, তাঁকে না জেনে তুমি যদি উদ্‌গীথ গান কর তাহলে তোমার মুণ্ডপাত হবে।

এরপর তিনি যজ্ঞের প্রতিহার-পাঠককে বললেন, শোনো প্রতিহার-পাঠক, প্রতিহারে যে দেবতা রয়েছেন, তাঁকে না জেনে তুমি যদি প্রতিহার পাঠ কর, তোমার মুণ্ডপাত হবে।

উষস্তির এসব মন্তব্য শুনে যজ্ঞের যজমান তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, দয়া করে আপনার পরিচয় আমার কাছে দিন, আমি জানতে চাই আপনি কে?

—আমি চক্রতনয় উষস্তি।

যজমান খুশি হয়ে বললেন, যজ্ঞের এইসব ঋত্বিক কর্মের জন্য আমি প্রথমে আপনাকেই খুঁজেছিলাম। কিন্তু আপনাকে না পেয়ে এঁদের বরণ করেছি। এখন আপনি এসেছেন। আমার একান্ত অনুরোধ, এই যজ্ঞের সমস্ত ঋত্বিক কর্ম আপনি স্বয়ং করুন।

উষস্তি বললেন, বেশ তাই হবে। কিন্তু আপনি আমাকে কি দেবেন?

—বলুন, আপনি কি চান?

—আপনি এই ঋত্বিকের যে পরিমাণ ধনসম্পদ দেবেন, আমাকেও ঠিক ততটুকু দেবেন।

—তাই দেব।

এরপরে প্রস্তাবপাঠক এসে উষস্তিকে বললেন, আপনি বলেছিলেন, প্রস্তাবে যে দেবতা রয়েছেন, তাঁকে না জেনে আমি যদি প্রস্তাবপাঠ করি, আমার মুণ্ডপাত হবে?

—হ্যাঁ। বলেছিলাম।

—আমি জানতে চাই সেই দেবতা কে?

উষস্তি উত্তর দিলেন, প্রাণই সেই দেবতা। এই সমস্ত চরাচর সর্ব-অর্থে প্রাণে প্রবেশ করে এবং প্রাণ থেকেই উৎপন্ন হয়। প্রাণদেবতাই প্রস্তাবে অনুগত হয়ে আছেন। তাঁকে না জেনেই তুমি প্রস্তাবপাঠ করছিলে।

এরপর উদ্‌গাতা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উষস্তিকে জিগ্যেস করলেন, আপনি বলেছিলেন, উদ্‌গীথে যে দেবতা অনুগত রয়েছেন, তাঁকে না জেনে উদ্‌গীথ গান করলে আমার মুণ্ডপাত হবে?

—বলেছিলাম।

—আমি জানতে চাই, সেই দেবতা কে?

উষস্তি উত্তর দিলেন, আদিত্যই সেই দেবতা। অথও

চরাচর এই আদিত্যের স্তব করে থাকেন। তাঁকে না জেনেই তুমি উদ্গীথ গান করছিলে।

এরপর প্রতিহার পাঠক এসে সবিনয়ে উষস্তিকে বললেন, আপনি বলেছিলেন যে দেবতা প্রতিহারে রয়েছেন, তাঁকে না জেনে প্রতিহার পাঠ করলে আমার মুণ্ডপাত হবে?

—হ্যাঁ। বলেছিলাম।

—আমি জানতে চাই, সেই দেবতা কে?

—অন্নই সেই দেবতা। এই সমগ্র চরাচর অন্নকে প্রতিহার অর্থাৎ নিজের প্রতি আহরণ করেই জীবনধারণ করে। অথচ তাঁকে না জেনেই প্রতিহার পাঠ করতে চেয়েছিলে।

বস্তুত উষস্তি এঁদের বোঝাতে চাইছেন, প্রস্তাব উদ্গীথ এবং প্রতিহার ভক্তিকে প্রাণ আদিত্য এবং অন্ন দৃষ্টিতে আরাধনা করা উচিত। এ হেন অর্চনার ফলে কর্মে সমৃদ্ধি আসে, মুখ্যপ্রাণের সঙ্গে একাত্মতা বৃদ্ধি পায়।

জানশ্রুতি এবং রৈক্কের উপাখ্যান

বিখ্যাত দাতা এবং দয়ালু হিসেবে রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ন সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। দেশের সর্বত্র তিনি প্রচুর পান্থশালা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সাধারণ মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহারের সুযোগ পায়। জানশ্রুতি দান করতেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে।

একদিন এক গ্রীষ্মকালের রাত্রিবেলা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসে জানশ্রুতি প্রাসাদের খোলা বারান্দায় বসে আছেন। ঠিক সেই সময় তিনি দেখলেন, মাথার ওপর দিয়ে কয়েকটি হাঁস উড়ে চলেছে। আসলে রাজা জানশ্রুতির শ্রদ্ধা ও দানে প্রসন্ন হয়ে কয়েকজন দেবতা হাঁসের রূপ ধরে রাজাকে দর্শন দিলেন।

সেই হাঁসদের মধ্যে একজন অগ্রগামী হাঁসকে উদ্দেশ্য করে পরিহাস করে বললেন, আরে শোনো শোনো, তুমি রাজার প্রভা অতিক্রম করো না। ওঁর প্রভা কিন্তু

দ্যুলোক পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। সে প্রভার সংস্পর্শে এলে দগ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অগ্রগামী হাঁস হেসে বললেন, ইনি কোন মহাত্মা বল তো ইনি কি রৈক্কের মতো ?

কয়েকজন দেবতা হাঁসের রূপ ধরে রাজা জানশ্রুতিকে দর্শন দিলেন।

প্রথম হাঁস উত্তর দিলেন, প্রাণীরা যা কিছু পুণ্য অর্জন করে, সমস্তই রৈক্কের পুণ্যফলের অন্তর্ভুক্ত হয়। রৈক্ক না জানেন, অন্য কেউ তা জানলেও আমি তাঁকে রৈক্কের মতো বলি।

—প্রাণীদের সমস্ত পুণ্যফল কেন রৈক্কের পুণ্যফলের অন্তর্ভুক্ত হয় ?

—কেননা ছোট ছোট পুণ্যফল তো আর বিশাল পুণ্যফলের অতিরিক্ত হতে পারে না।

খোলা বারান্দায় বিশ্রাম করতে করতে মহারাজ জানশ্রুতি হাঁসদের এইসব কথোপকথন শুনলেন। সকালবেলা তিনি তাঁর সারথিকে বললেন, আমার বন্দনা করতে বৈতালিকদের বারণ করে দাও।

—এ কথা কেন বলছেন মহারাজ ?

—এ ধরনের বন্দনা আমার প্রাপ্য নয়। রৈক্কই এর উপযুক্ত। তুমি কি রৈক্ককে চেনো ? না চিনলেও খোঁজ করে এসো। আমি তাঁর সঙ্গে দ্যাখা করতে চাই। তাঁর দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাচ্ছি না।

—রৈক্কের খোঁজ করার জন্য আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ছি মহারাজ।

জানশ্রুতির সারথি অনেক অনুসন্ধান করেও রৈক্কের দর্শন পেলেন না। বিফল হয়ে ফিরে এলেন। জানশ্রুতি তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তুমি একটি কাজ কর। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞের অনুসন্ধান করতে হয়, সেখানে তাঁর অনুসন্ধান কর।

জানশ্রুতির নির্দেশমতো অনুসন্ধান করে সারথি অবশেষে রৈক্কের খোঁজ পেলেন।

মহারাজ জানশ্রুতি তখন ছয়শো গাভী, প্রচুর কণ্ঠহার এবং ঘোড়ায় টানা রথ নিয়ে রৈক্কের কাছে এলেন। বললেন,

হে রৈক্ক, আমি এই সমস্ত আপনার জন্যই এনেছি। আপনি গ্রহণ করুন।

রৈক্ক জিগ্যেস করলেন, কেন আমি এসব গ্রহণ করব ?

জানশ্রুতি সবিনয়ে বললেন, আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, আমাকে তাঁর সম্পর্কে উপদেশ দিন।

রৈক্ক বিরক্ত হয়ে বললেন, ওসব উপহারে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি ফেরত নিয়ে যাও।

জানশ্রুতি ভাবলেন, রৈক্ক হয়তো আরো উপহার চাইছেন। তিনি তখন প্রসাদে ফিরে গিয়ে, আরো এক হাজার গাভী, অজস্র কণ্ঠহার, ঘোড়ায় টানা রথ এবং নিজের পরমাসুন্দরী কন্যাকে নিয়ে রৈক্কের কাছে এলেন।

বললেন, হে রৈক্ক—এই সমস্ত উপহার এবং এই পরমাসুন্দরী যুবতী নারী আমি আপনার জন্যে এনেছি। উপরন্তু এই যে গ্রামে আপনি বসবাস করছেন, সেটিও আপনার জন্য সংকল্পিত করেছি। আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

প্রিয়, মেধাবী, ব্রহ্মচারী, ধনদায়ী প্রভৃতি মানুষ বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র, একথা রৈক্ক জানতেন। জানশ্রুতিকে তিনি বললেন, তুমি দেখছি উপদেশ নেবেই। বেশ। তাহলে শোনো।

—বলুন।

—বায়ুকেই স্বর্গগুণ বিশিষ্ট বলে উপাসনা করবে। বায়ুও সম্বর্গ। নির্বাপিত হওয়ার পরে অগ্নি বায়ুতেই লীন হন। অস্তগমন করার পরে সূর্য বায়ুতেই লীন হন। অস্তমিত হওয়ার পরে চন্দ্র বায়ুতেই লীন হন। সঞ্চালিত করার শক্তি একমাত্র বায়ুরই রয়েছে। শুকিয়ে যাওয়ার পরে জল বায়ুতেই লীন হয়ে যান। বায়ুই এই সব কিছুকে আত্মসাৎ করেন। এটিই হচ্ছে দেবতাদের মধ্যে সম্বর্গ-দর্শন।

জানশ্রুতি বললেন, তারপর?

—তারপর শোনো, জীব যখন নিদ্রা যায়, সে সময় বাগিন্দ্রিয় প্রাণেই লীন হয়। চক্ষু প্রাণে লীন হয়। শ্রোত্র প্রাণে লীন হয়। মনও প্রাণেই লীন হয়। কেননা প্রাণই এই সব কিছুকে আত্মসাৎ করেন। মনে রাখবে দেবতাদের মধ্যে বায়ু এবং ইন্দ্রিয়দের মধ্যে প্রাণ সম্বর্গ গুণশালী।

অশ্বপতি ও ছয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্বানর আত্মা

উপমন্যুপুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষের পুত্র জন এবং অশ্বতরাশ্ব তনয় বুড়িল—এই পাঁচজন মহাশ্রোত্রিয় এবং মহাগৃহস্থ একত্র হয়ে আলোচনা করলেন, কে আমাদের আত্মা, কে ব্রহ্ম ! এখানে আত্মা এবং ব্রহ্ম পরস্পরের বিশেষণ ও বিশেষ্য। এর অর্থ আত্মাই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মই আত্মা। অর্থাৎ আত্মা থেকে ব্রহ্ম অভিন্ন কিংবা সর্বাত্মা বৈশ্বানরই একমাত্র উপাস্য।

আলোচনা করতে বসে পাঁচজনে ঠিক করলেন, তাঁরা সকলে মিলে অরুণপুত্র উদ্দালকের কাছে যাবেন। কেননা তিনি সম্প্রতি এই বৈশ্বানর[১] আত্মাকে জেনেছেন। এঁদের আসতে দেখে উদ্দালক ভাবলেন, এই পাঁচজন মহাগৃহস্থ এবং মহাশ্রোত্রিয় আমাকে প্রশ্ন করবেন।

---

১ বিশ্ব=সকল, নর=মানুষ, বিশ্ব+নর=বিশ্বানর=বৈশ্বানর, অর্থাৎ যিনি সকল মানবরূপে রয়েছেন। যিনি সকল মানবের আত্মরূপে রয়েছেন, তিনি বৈশ্বানর।

কিন্তু আমি নিজে এমন কি জানি, আমি আর তা এঁদের কি বলব ? তার চাইতে আমি বরং এদের আরেকজন উপদেষ্টার সন্ধান দিই।

এই কথা ভেবে উদ্দালক এঁদের বললেন, একটা কাজ করুন।

কেকয়পুত্র অশ্বপতি সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মাকে ভাল করে জেনেছেন। চলুন আমরা সকলে তাঁর কাছে যাই।

ছয়জনে মিলে রাজা অশ্বপতির কাছে গেলেন। রাজা এঁদের সকলের যথোচিত অভ্যর্থনা করে প্রচুর ধনসম্পত্তি দান করলেন। কিন্তু তাঁরা সেই দান গ্রহণ করলেন না। রাজা তখন বললেন, আমার রাজ্যে কোনো চোর নেই, কৃপণ নেই, মদ্যপায়ী নেই, আহিতাগ্নি ভিন্ন কোনো ব্রাহ্মণ নেই তাহলে আমার দান কেন আপনারা গ্রহণ করবেন না ? শিগগিরই আমি যজ্ঞ শুরু করব। সেই যজ্ঞে প্রত্যেক ঋত্বিককে যত দক্ষিণা দেওয়া হবে, আপনাদের ঠিক ততখানি দক্ষিণা দেওয়া হবে। আরো কয়েকদিন এখানে থেকে যান, তাহলে আরো ধনসম্পত্তি লাভ করবেন।

এই ছয়জন বললেন, আমরা ধনসম্পত্তির জন্য আসি নি।

—তাহলে ?

—আপনি বৈশ্বানর আত্মাকে জেনেছেন। আমরা আপনার কাছে তাঁর সম্পর্কে জানতে এসেছি। আমরা

ধনকামী নই, আমরা বিদ্যাকামী।
—বেশ। কাল সকালে আপনারা এ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
পরদিন সকালে ছয়জনে রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। অশ্বপতি প্রথমে প্রাচীনশালকে বললেন, বল তো তুমি, কিভাবে আত্মাকে উপাসনা কর ?
উপমন্যুতনয় উত্তর দিলেন, আমি আত্মাকে দ্যুলোক রূপে উপাসনা করি।
রাজা বললেন, তোমার উপাস্য আত্মাই সুতেজা নামে বিখ্যাত বৈশ্বানর আত্মা। এইজন্য তোমার বংশীয়েরা অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ। তোমার বংশধর হবেন খুবই সমৃদ্ধ এবং ধর্মপরায়ণ। সুতেজাকে উপাসনা করার দরুন তুমি অন্নভোজী হয়েছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করে থাকো। তবে তোমার উপাস্য সুতেজা হচ্ছেন আসলে বৈশ্বানর আত্মার মস্তক। আমার কাছে না এলে তোমার মস্তক পড়ে যেত।
এরপর রাজা অশ্বপতি সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে জিগ্যেস করলেন, এবার বলতো তুমি, কিভাবে আত্মাকে উপাসনা কর ?
সত্যযজ্ঞ উত্তর দিলেন, আমি আদিত্যকে আত্মারূপে উপাসনা করি।
অশ্বপতি বললেন, তুমি যাঁর উপাসনা কর, তিনিই

বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত বৈশ্বানর আত্মা। এই কারণে তোমার বংশে সব ধরনের ভোগের উপকরণ রয়েছে। প্রচুর ভোগ করবে তুমি। তুমি অন্নভোজী এবং প্রিয় বস্তু দর্শন করে থাকো। তোমার বংশে ব্রহ্মতেজের স্বষ্টি হয়। তবে তোমার উপাস্য হচ্ছেন বৈশ্বানর আত্মার চোখ। আমার কাছে না এলে তুমি অন্ধ হয়ে যেতে।

রাজা অশ্বপতি এরপরে ইন্দ্রদ্যুম্নকে জিগ্যেস করলেন, বল দেখি তুমি, কিভাবে আত্মার উপাসনা কর?

তিনি উত্তর দিলেন, আমি বায়ুর উপাসনা করি।

—তুমি যাঁর উপাসনা কর, তিনিই পৃথগ্‌বর্ত্মা নামে বৈশ্বানর আত্মা। এইজন্যে বিভিন্ন দিক থেকে তুমি উপহার পাও এবং বিভিন্ন রথ তোমাকে অনুসরণ করে। তুমি অন্নভোজী এবং প্রিয় বস্তু দর্শন কর। তোমার বংশে ব্রহ্মতেজ স্বষ্টি হয়। তবে তোমার উপাস্য দেবতা বৈশ্বানর আত্মার এক অঙ্গ প্রাণ। আমার কাছে না এলে তোমার প্রাণ বেরিয়ে যেত।

রাজা অশ্বপতি এবার শার্করাক্ষের পুত্র জনকে জিগ্যেস করলেন, বলতো তুমি, কিভাবে আত্মার উপাসনা কর?

তিনি উত্তর দিলেন, আমি আকাশের উপাসনা করি।

রাজা বললেন, তুমি যাঁর উপাসনা কর, তিনিই বহুল নামে বৈশ্বানর আত্মা। এই কারণে তুমি বহু সন্তান-

সন্ততি এবং বিত্তবৈভব লাভ করেছ। তবে ইনি হচ্ছেন আসল বৈশ্বানর আত্মার দেহের মধ্যভাগ। আমার কাছে না এলে তোমার দেহস্কন্দ শুকিয়ে যেত। আকাশই বহুল, কেননা তিনি সর্বব্যাপী।

এরপর রাজা অশ্বপতি, অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে জিগ্যেস করলেন, এবার বল, তুমি কিভাবে আত্মার উপাসনা কর ?

তিনি বললেন, আমি জলের উপাসনা করি।

অশ্বপতি বললেন, তোমার উপাস্য দেবতাই রয়ি নামে বৈশ্বানর আত্মা। রয়ি অর্থাৎ ধন। জল থেকে ধান উৎপন্ন হয়, অন্ন তৈরি হয় এবং অন্ন থেকে ধনসম্পদ ও দেহের পুষ্টি হয়। এই কারণে তুমি বিত্তবান ও পুষ্ট হয়েছ। তোমার বংশে ব্রহ্মতেজের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তোমার উপাস্য দেবতা আসলে বৈশ্বানর আত্মার বস্তি বা মূত্রাশয়। আমার কাছে না এলে তোমার মূত্রাশয় বিদীর্ণ হয়ে যেত।

রাজা অশ্বপতি এইবার উদ্দালক আরুণিকে জিজ্ঞেস করলেন, বল তো তুমি, কিভাবে আত্মার উপাসনা করো ?

আরুণি উত্তর দিলেন, রাজা, আমি পৃথিবীর উপাসনা করি।

রাজা বললেন, তোমার উপাস্য দেবতাই প্রতিষ্ঠা নামে বৈশ্বানর আত্মা। এই কারণে তুমি সুসন্তান লাভ করেছ

এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। কিন্তু ইনি হচ্ছেন বৈশ্বানর আত্মার দুটি চরণ। আমার কাছে না এলে তোমার দুটি পা শুকিয়ে যেত।

রাজা অশ্বপতি এবার সকলকে উদ্দেশ্য করেই বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই বৈশ্বানর আত্মাকে আলাদা-আলাদা-ভাবে জেনে এতদিন অন্ন গ্রহণ করেছ। কিন্তু যদি আমার উপদেশ মতো বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করতে পারো তাহলে আরও অনেক বেশি জ্ঞান লাভ করতে পারবে। মনে রেখো, দ্যুলোকই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, সূর্য তাঁর চোখ, বায়ু তাঁর প্রাণ, আকাশ তাঁর দেহের মধ্যভাগ, জল মূত্রাশয়, এবং পৃথিবী তার দুটি চরণ।

গুরু-শিষ্য সংবাদ

গুরু বলছেন, এই শরীরের মধ্যে যে ছোট্ট হৃদয়পদ্মরূপী প্রাসাদ রয়েছে, ব্রহ্মের অবস্থান তাঁরই মধ্যে। হৃদয়পদ্মের অন্তরাকাশ তিনি। তাঁকেই অন্বেষণ করতে হবে। তাঁকেই বিশেষভাবে জানার চেষ্টা করতে হবে। ব্রহ্মকেই আকাশ নামে অভিহিত করা হয়। তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কেননা তিনি আকাশের মতো সর্বব্যাপী, অশরীরী এবং সূক্ষ্ম। হৃদয়পদ্মই ব্রহ্মের উপলব্ধির জায়গা।

শিষ্যরা গুরুর একথার উত্তরে জিজ্ঞেস করলেন, হৃদয়পদ্মে এমন কি থাকতে পারে, যাকে বিশেষভাবে জানতে হবে অথবা যার অন্বেষণ করতে হবে ?

গুরু তার উত্তরে বলছেন, আকাশের যেমন পরিমাণ, হৃদয়ের মধ্যবর্তী আকাশের পরিমাণও ঠিক ততটুকুই। তারই মধ্যে স্থাপিত দ্যুলোক ও ভূলোক। তারই মধ্যে স্থাপিত অগ্নি ও

বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রবিন্দু। সকলেই তারই মধ্যে দেহ ধারণ করেছেন। এই দেহ যখন জরাগ্রস্ত হয়, বার্ধক্যে

গুরু বললেন, শরীরের মধ্যে যে হৃদয়পদ্মরূপী প্রাসাদ আছে, সেখানেই ব্রহ্মার অবস্থান।

যখন জীর্ণ হয়, অন্তরাকাশের ব্রহ্ম কিন্তু তখন জরাগ্রস্ত হন না। দেহ নষ্ট হলেও তিনি বিনষ্ট হন না। ইনিই আত্মা এবং ইনিই পাপহীন, মৃত্যুহীন, জরাহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন সদা সত্যসংকল্প সত্যকাম। ইহ জগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত উপভোগ কমে আসে। তেমনি পরলোকে কর্মের দ্বারা অর্জিত ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে আত্মাকে না জেনে যিনি দেহত্যাগ করেন, বিভিন্ন লোকে তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি হয় না। আর যিনি আত্মাকে সত্য জেনে দেহত্যাগ করেন, সমস্ত লোকে তার অপ্রতিহত গতি হয়। সেই মানব যদি পিতৃলোক কামনা করেন তবে তাঁর সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃগণের সঙ্গে মিলন হয়। সেই রকম মাতৃলোক কামনা করা মাত্রই মাতৃগণের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। ভগিনীলোক কামনা করা মাত্রই ভগিনীর সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। বন্ধুলোক কামনা করা মাত্রই বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। যদি তিনি সুখপ্রদ গন্ধ ও ফুলের মালা থেকে ভোগ কামনা করেন, সঙ্কল্প মাত্রই সমস্ত সুন্দর গন্ধ ও ফুলের মালা তাঁরই সঙ্গে মিলিত হয়। সেইরকম অন্ন ও পানীয় থেকে তিনি ভোগ লাভ করেন। গীত, বাদ্য ও সুন্দরী রমণীদের সান্নিধ্য সঙ্কল্প মতো লাভ করেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

মৃত্যুর উপাখ্যান

আগে এই সংসারের কিছুই ছিল না। জগৎ ছিল মৃত্যু দ্বারা আচ্ছন্ন। কেননা বুভুক্ষার আর এক নাম মৃত্যু। এখন সমনস্ক হওয়ার বাসনা থেকে মৃত্যু মনের সৃষ্টি করলেন। নিজেকেই তিনি করলেন আরাধনা। তাঁর এই আরাধনার সময় জলের সৃষ্টি হলো। সেই জলের ওপরে সরের মতো যা হয়েছিল, সেটি গাঢ় হলো। পরে, ক্রমশ সেটি পরিণত হলো পৃথিবীতে। পৃথিবীর সৃষ্টি হলো। প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। বিষণ্ণ পরিশ্রান্ত প্রজাপতির দেহ থেকে তেজস্বরূপ রস নির্গত হলো। তাঁরই নাম অগ্নি অর্থাৎ বিরাট্।

তিনি নিজেকে ত্রিধা-বিভক্ত করলেন। আদিত্য তাঁর এক-তৃতীয়াংশ বায়ু, এবং অগ্নি আরেক তৃতীয়াংশ।

সেই প্রাণ তখন ত্রিধা-বিভক্ত হলেন। পূর্বদিক তাঁর মস্তক, ঈশানকোণ ও অগ্নিকোণ তাঁর দুটি বাহু, পশ্চিমদিক তাঁর

পিছন, বায়ুকোণ ও নৈঋতকোণ তাঁর নিতম্বের দুই অস্থি, দক্ষিণ ও উত্তরদিক দুটি পার্শ্ব, দ্যুলোক তার পিঠ, অন্তরীক্ষ তাঁর উদর এবং পৃথিবী বুক। ইনিই জলে প্রতিষ্ঠিত। এইরকম যার জ্ঞান, যেখানেই তিনি যাবেন সেখানেই স্থিতি লাভ করবেন। খুব ভালভাবে এই অগ্নি জলে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্নির অর্চনা করতে হবে।

মৃত্যু এবার মনের সঙ্গে বাক্যের মিথুনভাব সম্পাদন করলেন, সেই মিথুনের যে রেতঃ সেটিই হলো সংবৎসর প্রজাপতি। তার আগে সংবৎসরকাল বলে কিছু ছিল না। কেননা সংবৎসরপ্রজাপতি হচ্ছেন আদিত্যাত্মক। আদিত্যের আগে কালের সৃষ্টি হতে পারে না। সংবৎসরের কালের পরিমাণ অনুযায়ী মৃত্যু সেই সংবৎসর প্রজাপতিকে নিজের অণ্ডের মধ্যে পালন করলেন। তারপর তিনি তাঁকে সৃষ্টি করলেন। এবং অণ্ড থেকে জাত সেই শিশুর উদ্দেশ্যে, তাঁকে খেয়ে ফেলার জন্য মৃত্যু মুখ হাঁ করলেন। তখন সেই শিশু ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। তারই নাম বাক্। মৃত্যু তখন ভেবে দেখলেন, আমি যদি এই শিশুটিকে কখনো মেরে ফেলি তাহলে অন্ন সৃষ্টি বেশি করতে পারব না। কেননা বিরাট্ হচ্ছেন অন্নের কারণ। তাঁকে খেয়ে ফেললে অন্নের বীজই নষ্ট হয়ে যাবে। এসব চিন্তা করে মৃত্যু সেই বাক্য এবং মনের দ্বারা ঋক্, যজু, সাম, ছন্দ, যজ্ঞ,

মানুষ এবং পশুকুলের সৃষ্টি করলেন। যা-যা তিনি সৃষ্টি করলেন, সবই আবার খেয়ে ফেলতে। চাইলেন, এর থেকে জানা যায় মৃত্যু সমস্তই আহার বা অদন করেন।
এবার মৃত্যু চিন্তা করলেন আমি আবার যজ্ঞ করব। যজ্ঞ করে পরিশ্রান্ত ও ক্লিষ্ট তাঁর দেহ থেকে যশ ও বীর্য বেরিয়ে এল। ইন্দ্রিয়বৃন্দই হচ্ছে যশ এবং বীর্য। তবু তাঁর মন দেহের প্রতি আসক্ত থেকে গেল।
অগ্নি এবং আদিত্য একই দেবতা অর্থাৎ মৃত্যু। এইরকম যিনি জানেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন অর্থাৎ মৃত্যু এঁকে দখল করেন না। কেননা মৃত্যুই এর আত্মা।

বিরাট্ ও জীবসৃষ্টি

প্রথম দিকে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মা বা বিরাট্ রূপেই ছিল। অনেক চিন্তা করে নিজের বাইরে তিনি কিছু দেখলেন না। প্রথম তিনি উচ্চারণ করলেন, 'আমি সেই'। সুতরাং সেই বিরাটের নাম হলো আমি। সেই থেকে 'আমি' চলে আসছে। সব মানুষই বলে, আমি। প্রথমে 'আমি' বলে তারপরে লোকে অন্য কথা বলে।

যাই হোক, সেই বিরাট্ এবার ভয় পেলেন। একা বলেই তাঁর ভয় হলো। এই সঙ্গে তিনি চিন্তা করলেন, কেন আমি ভয় পাচ্ছি। আমি ছাড়া আর যখন কেউ নেই, সেক্ষেত্রে আমার ভয় পাওয়ার অর্থ কি? আমি ভয় পাচ্ছি কেন? একমাত্র আমিই আছি। আর তো কেউ নেই। সুতরাং ভয় পাওয়ারও কোন অর্থ নেই। এইসব চিন্তা করে তার ভয় দূর হলো। কেননা দ্বিতীয় কেউ থাকলেই ভয় হতে পারে। আমিই সেই। আমিই সব।

আমার থেকেই সমস্ত। আমিই একমাত্র। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সেই বিরাট্ ভীত হয়েছিলেন বলে আজো লোকে একা হতে ভয় পায়। নিঃসঙ্গতাকে ভয় করে।

যাইহোক, বিরাটের ভয় দূর হলো কিন্তু তিনি সুখ বোধ করলেন না। আনন্দিত হলেন না। এই কারণে লোকে একলা থাকলে সুখী হয় না।

বিরাট্, এবার চিন্তা করলেন, আমার একজন সঙ্গী থাকলে বড় ভাল হতো। সঙ্গীর অভিলাষ করে তিনি নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। তার থেকে স্বামী এবং স্ত্রী জাত হলেন। নিজেকে স্বামী ভেবে তিনি সেই পত্নীর সঙ্গে মিলিত হলেন। তার ফলে মানুষের সৃষ্টি হলো।

সেই পত্নী ভাবলেন, এঁর থেকেই আমি সৃষ্টি হলাম। তাহলে আমার সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন কিভাবে? বেশ তো, আমি তাহলে অদৃশ্য হই। অদৃশ্য হওয়ার পরে তিনি গাভী হয়ে উদিত হলেন। সেই স্বামী তখন ষাঁড়ের রূপ ধরলেন। দুয়ের মিলন হলো এবং এতে সমস্ত গরুর সৃষ্টি হলো। এবার একজন ঘোটক অন্যজন ঘোটকী হলো। এইভাবে শেষপর্যন্ত দুজনের দ্বারা সমস্ত জীব সৃষ্টি হলো।

গার্গ্য এবং অজাতশত্রু

কোনো এক সময় দৃপ্তবালাকি নামে একজন বাগ্মী ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদিন তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে বললেন, আমি আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দেব। অজাতশত্রু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনার শুধু এই কথার ওপরেই আমি এক হাজার গরু দান করছি। দানধ্যানের ব্যাপারে আমি কারো চাইতে কম যাই না। অথচ লোকে এই দানের কথা উঠলেই রাজা জনকের কথা বলবে। ওই রকম গুণ আমারও প্রচুর আছে।

দৃপ্তবালাকি গার্গ্যগোত্রীয় ছিলেন বলে তাঁর আরেক নাম গার্গ্য।

অজাতশত্রুকে গার্গ্য বললেন, আদিত্য মণ্ডলের এই যে পুরুষ, তাঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। এঁকে আমি নিজের সঙ্গে অভিন্ন মনে করি। আপনিও তাই করুন।

অজাতশত্রু তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বললেন, একথা আপনি বলবেন না। এই ব্রহ্ম মোটেই আমার অজ্ঞাত নন। অনর্থক আপনি আমাকে অজ্ঞ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেন না। ব্রহ্ম সম্পর্কে আমার যে শুধু সাধারণ জ্ঞান আছে, তাই নয় আমি এঁর সমস্ত বিশেষণ এবং এঁকে উপাসনার ফলও জানি। আমি এঁকে সর্বাতীত নিখিল ভূতের মস্তক এবং জ্যোতিষ্মান্ বলে উপাসনা করি। যদি কেউ এঁকে একভাবে উপাসনা করতে পারেন, তিনি নিজেও সর্বাতীত নিখিল ভূতের মস্তক এবং জ্যোতিষ্মান্ হয়ে ওঠেন।

গার্গ্য এবার বললেন, চন্দ্রে অবস্থিত এই যে পুরুষ, তাঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বলে উঠলেন, আপনি এই ব্রহ্মের কথা মোটেই বলবেন না।

গার্গ্য বললেন, আমি চাই, আপনিও আমার মত এঁকে উপাসনা করুন।

অজাতশত্রু উত্তর দিলেন, আমি এঁকে মহান, শুক্লাম্বর এবং জ্যোতিষ্মান্ সোম বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি নিজে মহান, শুক্লাম্বর এবং জ্যোতিষ্মান্ সোম হয়ে ওঠেন।

গার্গ্য এবার বললেন, যে পুরুষ বিদ্যুতে অধিষ্ঠিত আছেন, এঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু উত্তর দিলেন, এ প্রসঙ্গ আপনি আমার কাছে তুলবেন না। আমি এঁকে তেজস্বী বলে উপাসনা করি। যিনি ব্রহ্মাকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি সকলেই এইরকম তেজস্বী হতে পারেন।

গার্গ্য বললেন, এই যে পুরুষ আকাশে এবং হৃদয়ে রয়েছেন, আমি তাঁকেই ব্রহ্মা বলে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বললেন, এ সম্পর্কে আমার কাছে বলবেন না। আমি এঁকে পূর্ণ ও অবিলুপ্ত স্বভাব বলে উপাসনা করি। এভাবে যিনি উপাসনা করেন, তিনি সুখী হন এবং তাঁর বংশ ইহলোক থেকে বিলুপ্ত হয় না।

গার্গ্য বললেন, এই যে পুরুষ প্রাণেও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তাঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বললেন, এ কথা আমার কাছে বলবেন না। আমি এঁকে অদম্য, সর্বাধীশ বলে উপাসনা করি। এভাবে যিনি উপাসনা করেন, তিনি সদা বিজয়ী এবং অপরাজেয় হন।

গার্গ্য বললেন, এই যে পুরুষ অগ্নিতে অধিষ্ঠিত, তাঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বললেন, এ কথা আমার কাছে বলবেন না। আমি এঁকে পরমসহিষ্ণু বলে উপাসনা করি। এভাবে উপাসনা করলে মানুষ পরমসহিষ্ণু হতে পারে।

গার্গ্য বললেন, এই যে পুরুষ জলে অধিষ্ঠিত, তাঁকেই আমি

ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বললেন, এ প্রসঙ্গ আমার কাছে তুলবেন না। আমি এঁকে অনুরূপ বলে উপাসনা করি। যিনি এভাবে উপাসনা করেন তাঁর কাছে অনুরূপ বস্তুই উপস্থিত হয়। অনুরূপ সন্তান জাত হয়।

গার্গ্য বললেন, এই যে পুরুষ দর্পণে অবস্থিত তাঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বললেন, এ প্রসঙ্গ আমার কাছে টানবেন না। আমি এঁকে দীপ্তিস্বভাব বলে উপাসনা করি। এভাবে যদি কেউ উপাসনা করেন, তিনি দীপ্তিস্বভাব হন আর দীপ্তির আধার বহু বলে সেই উপাসনার ফল তাঁর সন্তানদের মধ্যেও দেখা যায়।

গার্গ্য বললেন, চলমান প্রাণীর পেছনে উত্থিত শব্দের মধ্যে এই যে পুরুষ অবস্থিত, তাঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বললেন, এ কথা আমার কাছে বলবেন না। আমি এঁকে জীবন কারণ প্রাণ বলে উপাসনা করি। এভাবে যিনি উপাসনা করেন, তিনি পূর্ণায়ু পান, অসময়ে তাঁর মৃত্যু হয় না।

গার্গ্য বললেন, এই যে পুরুষ সমস্ত দিকে অবস্থিত, তাঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এ কথা আমার কাছে বলবেন না। আমি

এঁকে অবিযুক্ত বলে উপাসনা করি। এভাবে যিনি উপাসনা করেন, তাঁর পরিজনেরা তাঁকে কখনো ছেড়ে যায় না।

গার্গ্য বললেন, ছায়াতে এই পুরুষ, তাঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বললেন, এ কথা আমার কাছে বলবেন না। আমি এঁকে মৃত্যু বলে উপাসনা করি। এভাবে উপাসনা যিনি করেন অসময়ে তাঁর মৃত্যু হয় না।

গার্গ্য বললেন, এই যে পুরুষ প্রজাপতিতে অবস্থিত, তাঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বললেন, একথা আমার কাছে বলবেন না। আমি এঁকে সংযত বুদ্ধি বলে উপাসনা করি। এভাবে যিনি উপাসনা করেন, তিনি সংযতাত্মা হন। তাঁর বংশও সংযত বুদ্ধি হয়।

গার্গ্য নীরব হয়ে রইলেন। অজাতশত্রু জিজ্ঞেস করলেন, আর কোনো কথা আছে?

গার্গ্য উত্তর দিলেন, না। আর কথা নেই।

—এইটুকু জানলেই ব্রহ্মকে জানা যায় না কিন্তু, গার্গ্য বললেন, আমি আপনার শিষ্য হতে চাই।

আসলে শিষ্যত্ব গ্রহণ না করলে গুরুর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায় না। এই আচারবিধি গার্গ্য জানতেন বলেই ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয় রাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলেন।

অজাতশত্রু বললেন, একবার এক ব্রাহ্মণ, জানেন, ব্রহ্মোপদেশ পাওয়ার জন্য এক রাজার কাছে গেলেন। রাজা তাঁকে বললেন, আমি আপনাকে উপদেশ না দিয়ে এমনিই বুঝিয়ে দেব। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। দুজনে এক ঘুমন্ত মানুষের কাছে এলেন। রাজা সেই লোকটিকে 'হে মহান,' 'হে শুক্লাম্বর' 'হে জ্যোতিষ্মান্' এইসব বলে ডাকলেন। কিন্তু লোকটি তাতে একটুও সাড়া দিল না। তখন রাজা তাকে হাত দিয়ে বারে বারে ঠেলে জাগালেন। তখন সে উঠল। আচ্ছা বলুন তো গার্গ্য, সেই যে ঘুমন্ত পুরুষ যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন তিনি কোথায় ছিলেন ? কোথা থেকে তিনি এভাবে এলেন ?

গার্গ্য চুপ করে রইলেন। অজাতশত্রু বুঝলেন, গার্গ্য এর উত্তর জানেন না। তিনি তখন বললেন, এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিদ্রিত অবস্থায় বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞান গ্রহণ করে হৃদয় মধ্যের আকাশে অবস্থান করেন। তখন তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংগৃহীত হয়। বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র এবং মন সবই গৃহীত হয়। রাজা, যেমন পাত্র, মিত্র, অমাত্য নিয়ে নিজ রাজ্যে ইচ্ছে-মতো ভ্রমণ করেন, তেমনি আত্মাও স্বপ্নকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়ে নিজের শরীরে যথেচ্ছ ভ্রমণ করেন। আবার তিনি যখন সুষুপ্ত হন, বাহাত্তর হাজার হিতা

নামক নাড়ীকে হৃদয়ে ফিরিয়ে এনে শরীরে অবস্থান করেন। তখন তাঁর গভীর নিদ্রা। আনন্দের চরম অবস্থা। সেই সময়ে প্রদীপ যেমন এক জায়গায় থেকে সর্বত্র আলোক বিস্তার করে, আত্মাও তেমনি হৃদয়ে থেকে সমস্ত শরীর চৈতন্যময় করে রাখে।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

প্রসিদ্ধ বিদেহ সম্রাট জনক একবার বহু দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে কুরু ও পঞ্চাল দেশ থেকে প্রচুর ব্রাহ্মণ সমাগত হয়েছিলেন। সে-সময়ে এই দুটি দেশই বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিল। বিদেহ সম্রাট জনকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ!

এ কথা ভেবে তিনি একহাজার গাভী গোষ্ঠে বেঁধে রেখে প্রতিটি গাভীর দুটি সিংয়ে দশ-দশ পাদ সোনরে গয়না পরিয়ে দিলেন। এবার জনক সেই ব্রাহ্মণদের বললেন, হে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ, যিনি আপনাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এইসব গাভী নিয়ে যান। উপস্থিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউই নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞ বলে প্রকাশ করার সাহস পেলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক তাঁর এক শিষ্যকে বললেন, এই গাভীগুলিকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাও। শিষ্যটি গুরুর নির্দেশমতো কাজ করলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের এ হেন আচরণ দেখে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা খুবই বিরক্ত হলেন। তাঁরা ভাবলেন, ইনি কিভাবে নিজেকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলে দাবি করতে পারেন? অশ্বল নামে মহারাজ জনকের এক হোতা যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, আপনি বুঝি আমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, ব্রহ্মিষ্ঠকে আমি প্রণাম জানাই। আসলে আমার ওই গাভীগুলিকে প্রয়োজন ছিল। আমি নিছক গোধনকামী। হোতা অশ্বল তখন ঠিক করলেন, তিনি যাজ্ঞবল্ককেই প্রশ্ন করবেন। যদিও প্রাথমিক কথাবার্তার সময়ে যাজ্ঞবল্ক কোনোরকম ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেন নি।

অশ্বল প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক, আপনি তো জানেন, এই সবই মৃত্যুর দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মৃত্যুর বশীভূত। এখন বলুন তো একজন যজমান কোন উপায়ে মৃত্যুর অধীনতা অতিক্রম করে মুক্ত হবেন? কি সেই উপায়?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, হোতৃরূপী ও অগ্নিরূপী বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে। যজমানের বাক্‌ই হোতা, সেই বাক্‌ এই অগ্নিদেবতা এবং অগ্নিই হোতা। সেই অগ্নিই মুক্তি।

অশ্বল আবার প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক, সবই যখন অহোরাত্রের অধীন, যজমান কোন উপায়ে এই কবল থেকে মুক্ত হবেন?

—অধ্বর্যু এবং চক্ষুরূপী আদিত্যের সাহায্যে। অধ্বর্যু সেই চোখই আদিত্য দেবতা আবার আদিত্যই অধ্বর্যু।

অর্থাৎ যিনি যর্জুমন্ত্র পাঠ করেন, আহুতি দেন এবং যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ তৈরি রাখেন। যজমানের চোখই অধ্বর্যু। ইনিই মুক্তির উপায়। আদিত্যে আত্মভাবপ্রাপ্ত মানুষের দিনরাত বলে কিছু নেই।

—আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক্য, সবই যখন শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের অধীন, যজমান সেক্ষেত্রে কোন উপায়ে এই কবল থেকে মুক্ত হবেন ?

—উদ্‌গাতা নামে ঋত্বিক ও বায়ুরূপী প্রাণের সাহায্যে প্রাণ, বায়ু ও চন্দ্র অভিন্ন। যজমানের প্রাণই উদ্‌গাতা। যজমানের প্রাণই বায়ুদেবতা আবার বায়ুই উদ্‌গাতা। প্রাণ এবং উদ্‌গাতাকে বায়ুরূপে দর্শনই মুক্তি।

—যজমান কি আশ্রয় করে স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হবেন ?

—ব্রহ্মা নামে ঋত্বিক এবং মনোরূপী চন্দ্রদেবতাকে আশ্রয় করে। যজমানের মনই চন্দ্র। ওই চন্দ্র ব্রহ্মা। মন ও ব্রহ্মাকে চন্দ্ররূপে দর্শনই মুক্তি।

—বলুনতো যাজ্ঞবল্ক্য এই হোতা আজ এ যজ্ঞে কয়টি ঋগ্‌জাতির দ্বারা স্তুতি পাঠ করবেন ?

—তিনটির দ্বারা।

—সেগুলি কি কি ?

—পুরোনুবাক্যা, যাজ্যা এবং শস্যা।

—সেগুলির সাহায্যে তিনি কি জয় করবেন ?

—এই সমস্ত প্রাণী।

—বলুন তো যাজ্ঞবল্ক এই অধ্বর্যু আজ এ যজ্ঞে কয় ধরনের আহুতি দেবেন ?
—তিন ধরনের।
—সেগুলি কি কি ?
—যেসব আহুতি হুত হয়ে সমুজ্জ্বল হয়, হুত হয়ে যেগুলি শব্দধারণ করে এবং হুত হয়ে যেগুলি মাটির নিচে চলে যায়।
—তাদের দ্বারা তিনি কি জয় করবেন ?
—প্রথম আহুতি দিয়ে তিনি দেবলোক জয় করবেন। কেননা দেবলোক দেদীপ্যমান। দ্বিতীয় ধরনের আহুতি দিয়ে তিনি পিতৃলোক জয় করবেন। কেননা পিতৃলোক কোলাহলময় তৃতীয় ধরনের আহুতি দিয়ে তিনি মনুষ্যলোক জয় করবেন। কেননা সেটি নিচে অবস্থিত।
—আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক এই ব্রহ্মা আজ কয়জন দেবতার সাহায্যে যজ্ঞকে দক্ষিণ দিকে রক্ষা করবেন ?
—একজন দেবতার সাহায্যে।
—সেই একজন কে ?
—মন। কারণ অনন্ত বলে মন প্রসিদ্ধ। এই উপাসনার সাহায্যে তিনি অনন্তলোক জয় করবেন।
—বলুন যাজ্ঞবল্ক্য আজ এ যজ্ঞের এই উদ্‌গাতা কয় ধরনের স্তোত্র গান করবেন।
—তিন ধরনের।
—সেগুলি কি কি ?

—পুরোনুবাক্য, যাজ্যা এবং শস্যা।
—শরীর সম্বন্ধীয় স্তোত্রগুলি কি কি?
—প্রাণই পুরোনুবাক্যা, অপান যজ্যা এবং ব্যান শস্যা।
—তাঁদের দ্বারা কি জয় করবেন?
—পুরোনুবাক্যার সাহায্যে পৃথিবীলোক, যাজ্যার সাহায্যে অন্তরীক্ষলোক এবং শস্যার সাহায্যে দ্যুলোক জয় করবেন।
এবার অশ্বল নীরব হয়ে গেলেন।

এরপর জারৎকারব আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।
প্রথমে তিনি প্রশ্ন করলেন, বলুন তো যাজ্ঞবল্ক্য গ্রহ কয়টি এবং অতিগ্রহ কয়টি?
যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, গ্রহ আটটি! অতিগ্রহ ও আটটি।
—সেগুলি কি কি?
—প্রাণই গ্রহ। সে অপানরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীভূত। অপানের সাহায্যে আমরা গন্ধ আঘ্রাণ করি। বাক্ই গ্রহ। নামরূপ অতিগ্রহের দ্বারা সে বশীভূত।

বাদের সাহায্যে লোকে বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করে। জিহ্বাই গ্রহ। রসরূপ অতিগ্রহের দ্বারা সে বশীভূত। কেননা জিহ্বার সাহায্যেই লোকে বিভিন্ন রস আস্বাদ করে। চক্ষুই গ্রহ। রূপনামে অতিগ্রহের দ্বারা সে বশীভূত। কেননা চক্ষুর সাহায্যে লোকে বিভিন্ন রূপ দর্শন করে। শ্রবণই গ্রহ। শব্দরূপী অতিগ্রহের দ্বারা সে বশীভূত। শ্রবণের সাহায্যে লোকে বিভিন্ন শব্দ শোনে। মনই গ্রহ। কামরূপ অতিগ্রহের দ্বারা সে বশীভূত। কেননা মনের সাহায্যেই লোকে সমস্ত কাম্য বিষয় কামনা করে। দুটি হাত গ্রহ। কর্মরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীভূত। কারণ দুই হাতের সাহায্যে লোকে কাজ করে। ত্বক্ই গ্রহ। স্পর্শরূপ অতিগ্রাহের দ্বারা সে বশীভূত। কেননা ত্বকের সাহায্যে লোকে স্পর্শ অনুভব করে। এগুলিই আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ।

—আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক্য, সবই যখন মৃত্যুর অন্ন তাহলে এমন কোন দেবতা আছে, মৃত্যু যার অন্ন ?

—অগ্নিই মৃত্যু। আবার তিনি জলের অন্ন। এরকম যিনি জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন। মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। এই চরম মৃত্যুর অর্থ ব্রহ্ম। তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর সাক্ষাতের দরুনই সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সর্বমৃত্যুরূপী ব্রহ্মের আর মৃত্যু নেই। যিনি চরম মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ তিনিই।

—যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্মজ্ঞানী প্রাণত্যাগ করলে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বেরিয়ে যায় না কি বেরোয় না ?

—বেরোয় না। সেগুলি তাঁরই মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়। দেহ তখন স্ফীত হয়, বায়ুতে পূর্ণ হয় এবং নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে থাকে।

—আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষের যখন মৃত্যু হয়, কোন বস্তু তখন তাঁকে ত্যাগ করে না ?

—নাম। কারণ নামই অনন্ত। বিশ্বদেবতারাও অনন্ত। এইরকম যিনি জানেন তিনি অনন্তলোক জয় করেন। ব্রহ্মজ্ঞের দেহত্যাগের পরেও তাঁর নাম অনন্তকাল জগতে বেঁচে থাকে।

—মৃত ব্যক্তি বাক্ অগ্নিতে লীন হয়। প্রাণ লীন হয় বায়ুতে। চোখ আদিত্যে, মন চন্দ্রে, শ্রোত্র দিক্‌সমূহে, শরীর পৃথিবীতে, সমস্ত লোম বিভিন্ন ওষধিতে, সমস্ত কেশ বিভিন্ন বৃক্ষে আর তাঁর শুক্র এবং শোণিত লীন হয় জলে। সেই মৃতব্যক্তিই তখন কি আশ্রয় করে থাকে ? যাজ্ঞবল্ক্য তখন বললেন, প্রিয় আর্তভাগ, আসুন আমরা হাত ধরাধরি করে বাইরে যাই। আমরা দুজনে শুধু এই তত্ত্বটি আলোচনা করব। লোকজনের মধ্যে এটি আলোচনা করা যাবে না।

আর্তভাগকে নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে আলোচনা করলেন। তাঁদের আলোচনা মূলত

কর্মসম্বন্ধীয় হয়েছিল। তাঁরা কর্মের প্রশংসা করেছিলেন।

আর্তভাগ বললো, পুরুষের মৃত্যু হলে কোনো বস্তু তাঁকে ত্যাগ করে না?

এইজন্যে লোকে পুণ্যের ফলে পুণ্যবান এবং পাপের

ফলে পাপী হয়।

জারৎকারব আর্তভাগ এরপরে আর প্রশ্ন করেন নি।

এরপর লাহ্যায়নি ভুজ্যু যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। বললেন, আমি আপনাকে একটা গল্প বলছি। সেই গল্পের ওপরেই আমার প্রশ্ন নির্ভর করছে।

—কি প্রশ্ন? বলুন। আগে আপনার গল্পটি শুনি।

ভুজ্যু বললেন, ব্রতচারী হয়ে আমরা একবার মদ্রদেশে পর্যটনে গিয়েছিলাম। পর্যটন করতে করতে কাপ্য পতঞ্চলের গৃহে উপস্থিত হলাম। তাঁর কন্যা গন্ধর্বাবিষ্টা ছিলেন। সেই গন্ধর্বকে আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আঙ্গিরস সুধন্বা। আমরা তাঁকে বিভিন্ন লোকের সীমা জিগ্যেস করলাম, পারিক্ষিতেরা কোথায় গিয়েছেন? তিনি আমাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এখন, যাজ্ঞবল্ক্য, আমি আপনাকে জিগ্যেস করছি, পরিক্ষিতেরা কোথায় গিয়েছেন? আপনি উত্তর দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, সেই গন্ধর্বের উত্তর আমি বলে দিচ্ছি।

—বলুন।

—তিনি বলেছিলেন, যেখানে অশ্বমেধযাজীরা যান, সেখানেই পারিক্ষিতেরা গিয়েছেন।

ভুজ্যু প্রশ্ন করলেন, অশ্বমেধযাজীরা কোথায় যান?

কোন লোকে যান ? তাহলেই জানা যাবে, পারিক্ষিতেরা কোথায় গিয়েছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, সূর্যের রথ একদিনে যে পথ অতিক্রম করে, তাকে বত্রিশ গুণ করলে যা হবে, সেটিই হচ্ছে এই লোকের পরিমাণ। তার দ্বিগুণ স্থলে আচ্ছন্ন করে রয়েছে পৃথিবী ; এই লোকের চারপাশে যে অবস্থিত, তার দ্বিগুণ স্থলে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন সমুদ্র। পৃথিবীর চারপাশে যে অবস্থিত। এখন যজ্ঞাগ্নি শ্যেনরূপ ধারণ ক'রে তাদের বহন করে নিয়ে গেলেন বায়ুর কাছে। বায়ুকে অর্পণ করলেন। অশ্বমেধযাজীদের বাসস্থানে বায়ু তাঁদের নিয়ে গেলেন, সুতরাং বায়ু ব্যশিষ্ঠ এবং বায়ুই সমষ্টি। এইরকম যিনি জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর শুনে ভুজ্য লাহ্যায়নি নীরব হলেন। এরপর উষস্তি চাক্রায়ণ তাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, তিনি বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সর্বান্তর আত্মা এবং সাক্ষাত অপরেক্ষি ব্রহ্ম, তাঁর বিষয়ে আমার কাছে একটু বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, সর্বান্তর ইনি আপনার আত্মা।

—কোন আত্মাটি সর্বান্তর, যাজ্ঞবল্ক ?

—যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া করেন। যিনি অপানের দ্বারা অপান ক্রিয়া করেন। যিনি ব্যানের দ্বারা ব্যানক্রিয়া করেন। যিনি উদানের দ্বারা উদানক্রিয়া করেন। সর্বান্তর

ইনিই আপনার আত্মা, উষস্তি বলে উঠলেন, যিনি সাক্ষাত অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা, তাঁরই কথা আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক উত্তর দিলেন, সর্বান্তরবর্তী ইনিই আপনার আত্মা।

—কোনটি সর্বান্তর, যাজ্ঞবল্ক।

—দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা তাঁকে কেউ ছাখে না। শ্রবণের শ্রোতাকে কেউ শোনেন না। মনোবৃত্তির মননকারীকে কেউ ভাবতে পারেন না। বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞাতাকে কেউ জানতে পারেন না। সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা। এছাড়া আর সব বিনাশী।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর শুনে উষস্তি চাক্রায়ণ আর প্রশ্ন করলেন না।

এরপর কহোল কৌষীতকেয় তাঁকে প্রশ্ন করলেন। বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাত অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা তাঁর কথা আমাকে বিশেষভাবে বলুন।

—সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা।

—কোনটি সর্বান্তর, যাজ্ঞবল্ক্য।

—যিনি ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ ও জরামৃত্যুর অতীত, সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা। যা পুত্রকামনা তাই বিত্তকামনা, আবার যা বিত্তকামনা তাই আবার লোক-কামনা। কেননা দুটোই কামনা। সুতরাং এই আত্মাকে জেনে ব্রাহ্মণগণ পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও

লোককামনা থেকে ব্যুত্থিত হয়ে ভিক্ষাটন অবলম্বন করবেন। এই কারণে ব্রাহ্মণ আত্মবিদ্যা লাভ করেন আত্মবিদ্যারূপ শক্তিতে অবস্থান করতে ইচ্ছে করবেন। তারপর মননশীল হবেন। মনন ও অমনন ভালভাবে জেনে তারপর যথার্থ ব্রাহ্মণ হয়ে উঠবেন। সেই ব্রাহ্মণ কিরকম আচারশীল হবেন? এটিও আপনার জানার ইচ্ছে হতে পারে। এরও উত্তর বলে দিচ্ছি। তিনি যেমন আচারই করুন না কেন, তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবই বিনাশী।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর শুনে কহোল কৌষীতকেয় নীরব হয়ে গেলেন।

এরপর গার্গী বাচক্নবী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন।

তিনি প্রথমে জিগ্যেস করলেন, আপনি তো জানেন যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই জলে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। এখন বলুন তো জল কিসে ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, বায়ুতে।

—বায়ু কিসে ওতপ্রোত?

—অন্তরীক্ষলোকে।

—অন্তরীক্ষলোক কিসে ওতপ্রোত ?

—গন্ধর্বলোকে।

—গন্ধর্বলোক কিসে ওতপ্রোত ?

—আদিত্যলোকে।

—আদিত্যলোক কিসে ওতপ্রোত ?

—চন্দ্রলোকে।

—চন্দ্রলোক কিসে ওতপ্রোত ?

—নক্ষত্রলোকে।

—নক্ষত্রলোক কিসে ওতপ্রোত ?

—দেবলোকে।

—দেবলোক কিসে ওতপ্রোত ?

—ইন্দ্রলোকে।

—ইন্দ্রলোক কিসে ওতপ্রোত ?

—প্রজাপতিলোকে।

—প্রজাপতিলোক কিসে ওতপ্রোত ?

—ব্রহ্মলোকে।

—ব্রহ্মলোক কিসে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য তখন হেসে বললেন, হে গার্গি, আমাকে অতি প্রশ্ন করবেন না। , আপনার যেন মুণ্ডপাত না হয়। আপনি জানেন ব্রহ্ম অতিপ্রশ্নের বিষয় হতে পারে না অথচ আপনি তাঁরই সম্পর্কে অতিপ্রশ্ন করছেন সুতরাং আবার বলছি গার্গি, অতিপ্রশ্ন করবেন না। আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।

এই কথা শুনে গার্গি বাচক্নবী নীরব হয়ে রইলেন।

এরপর উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য আমরা একসময়ে মদ্র দেশে পঞ্চতল কাপ্যের গৃহে বসবাস করেছিলাম। তাঁর স্ত্রী গন্ধর্বাবিষ্টা হয়েছিলেন। সেই গন্ধর্বকে আমরা জিগ্যেস করেছিলাম, আপনি কে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি কবন্ধ আর্থবন। সেই গন্ধর্ব পতঞ্চল কাপ্য ও তার শিষ্যদের জিগ্যেস করলেন, তুমি কি কাপ্য সেই সূত্র জানো? যার দ্বারা এই জীবন পরজীবন ও সর্বভূত সংগ্রথিত রয়েছে? কাপ্য উত্তর দিয়েছিলেন, আমি তো তা জানি না। এরপর গন্ধর্ব আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, কাপ্য তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জানো? যিনি গভীরে থেকে এই জীবন পরজীবন এবং সর্বভূতকে নিয়মিত করেন? কাপ্য আবার উত্তর দিলেন, আমি তো তা জানি না। গন্ধর্ব তখন বললেন, শোনো কাপ্য, সেই সূত্রে এবং সেই অন্তর্যামীকে যিনি এভাবে জানেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্। তিনি লোকবিদ্। তিনি দেববিদ্। তিনি বেদবিদ্। তিনি ভূতবিদ্। তিনি আত্মবিদ্। তিনিই সর্ববিদ্। তারপর তিনি সেগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমরা সে ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। আমি সেই সবই জানি। যাজ্ঞবল্ক্য, সেই সূত্র এবং সেই অন্তর্যামীকে না জেনে যদি আপনি এইসব গাভী নিয়ে যান, আপনার মস্তক তাহলে ভূপতিত হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, আমি সেই সূত্র এবং সেই অন্তর্যামীকে অবশ্যই জানি।
উদ্দালক আরুণি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, ওরকম জানি জানি সবাই বলতে পারি। কেমন জানেন সেটা একবার বলুন দেখুন ?
যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, গৌতম, বায়ুই সেই সূত্র বায়ুরূপ সূত্রের সাহায্যে এই জীবনপরজীবন এবং সমস্ত প্রাণী সংগ্রথিত রয়েছে। এইজন্য মৃত মানুষ সম্পর্কে লোকে বলে, এর দেহ পতিত হয়েছে। কেননা বায়ুরূপ সূত্রেই সব সংগ্রথিত।
উদ্দালক তখন বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন যাজ্ঞবল্ক। এখন অন্তর্যামীর কথা বলুন দেখি।
যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, যিনি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকেন অথচ পৃথিবী দেবতা তাঁকে জানেন না, পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি পৃথিবী দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী এবং অমর। তিনিই আপনার আত্মা। যিনি জলে বিদ্যমান অথচ জলদেবতা যাঁকে জানেন না, জল যার শরীর, আছেন জলদেবতাকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন তিনিই অন্তর্যামী এবং অমৃত। তিনিই আপনার আত্মা। এইরকম যিনি অগ্নি দেবতার অগোচরে অন্তরীক্ষে রয়েছেন, বায়ু দেবতার অগোচরে বায়ুতে রয়েছেন, দ্যুলোক দেবতার অগোচরে দ্যুলোকে রয়েছেন, সূর্য দেবতার অগোচরে সূর্যে রয়েছেন

দিগ্‌ দেবতার অগোচরে দিক্‌সমূহে রয়েছেন, চন্দ্রতারকা দেবতার অগোচরে চন্দ্রতারকায় রয়েছেন, আকাশ দেবতার অগোচরে যিনি আকাশে রয়েছেন, তমো দেবতার অগোচরে যিনি অন্ধকারে রয়েছেন, তেজোদেবতার অগোচরে যিনি তেজে রয়েছেন, সর্বভূতদেবতার অগোচরে যিনি সর্বভূতে রয়েছেন, প্রাণ দেবতার অগোচরে যিনি প্রাণে রয়েছেন, বাগ্‌দেবতার অগোচরে যিনি বাগিন্দ্রিয়ে রয়েছেন, চক্ষুর্দেবতার অগোচরে যিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ে রয়েছেন, শ্রবণ দেবতার অগোচরে যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে রয়েছেন, মনোদেবতার অগোচরে যিনি মনে রয়েছেন, ত্বগ্‌দেবতার অগোচরে যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ে রয়েছেন, বুদ্ধি-দেবতার অগোচরে যিনি বিজ্ঞানে অথবা বুদ্ধিতে রয়েছেন, যিনি জননেন্দ্রিয়দেবতার অগোচরে জননেন্দ্রিয়ে রয়েছেন, তিনিই অন্তর্যামী এবং অমৃত। তিনিই আপনার আত্মা। অদৃষ্ট হলেও তিনি দ্রষ্টা, অশ্রুত হলেও শ্রোতা, মননের অবিষয় হলেও মন্তা, অবিজ্ঞাত হলেও বিজ্ঞাতা, তিনি ছাড়া কোনো দ্রষ্টা নেই, তিনি ছাড়া শ্রোতা নেই, তিনি ছাড়া মন্তা নেই, তিনি ছাড়া বিজ্ঞাতা নেই ইনি অন্তর্যামী এবং অমৃত। ইনিই আপনার আত্মা। ইনি ছাড়া আর সমস্তই বিনাশী।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর শুনে উদ্দালক আরুণি নীরব হয়ে গেলেন।

তারপর গার্গি বললেন, আমি আপনাকে আর ছুটি প্রশ্ন করব। যদি আপনি সেগুলির উত্তর দিতে পারেন, তাহলে কেউ কখনো আপনাকে ব্রহ্মবিচারে পরাজিত করতে পারবেন না। বলুন তো যাজ্ঞবল্ক্য বর্তমান, ভবিষ্যত এবং অতীত কিসে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, এই সব কিছু আকাশে ওতপ্রোত। গার্গি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আকাশ কিসে ওতপ্রোত ? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আকাশ যাতে ওতপ্রোত কাউকে ভক্ষণ করেন না আবার কেউ তাকে ভক্ষণ করেনও না। ব্রহ্মজ্ঞেরা এঁকে সেই অক্ষর বলে থাকে। এঁরই প্রশাসনে সূর্য, চন্দ্র অবস্থান করছেন। দ্যুলোক ও ভূলোক অবস্থান করছেন। এঁরই প্রশাসনে নিমেষ মুহূর্ত দিবারাত্র পক্ষ, মাস, ঋতু এবং সংবৎসর অবস্থান করছেন। সমস্ত নদী এঁরই প্রশাসনে নিজ নিজ নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হচ্ছেন। এঁরই প্রশাসনে আমরা দাতার প্রশংসা করি, দেবতারা যজমানের অনুগত হন এবং পিতৃগণ দবীহোমের ওপর নির্ভর করেন। এই অক্ষরকে না জেনে কেউ যদি বহু হাজার বৎসর হোম, যজ্ঞ বা তপস্যা করে তবু কোনো, লাভ হয় না। এই অক্ষরকে না জেনে কেউ যদি প্রাণ ত্যাগ করে, সে দুঃখী। একে জেনে যে প্রাণত্যাগ করে, তিনি ব্রাহ্মণ। শুনুন গার্গি, এই যে অক্ষর ইনি অদৃষ্ট হলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হলেও শ্রোতা, মননের অবিষয়

হলেও মন্তা, অবিজ্ঞাত হলেও বিজ্ঞাতা, তিনি ছাড়া কোনো দ্রষ্টা নেই, তিনি ছাড়া কোনো শ্রোতা নেই, তিনি ছাড়া কোনো মন্তা নেই, তিনি ছাড়া কোনো বিজ্ঞাতা নেই। জেনে রাখুন, আকাশ ওতপ্রোত রয়েছে এই অক্ষরেই।

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে গার্গি সমবেত ব্রাহ্মণদের বললেন, আপনারা এঁকে আর প্রশ্ন করার চেষ্টা করবেন না। কেননা ব্রহ্মবাদে এঁকে পরাস্ত করার ক্ষমতা আপনাদের কারো নেই। এই পর্যন্ত বলে গার্গি নীরব হলেন।

এরপর বিদগ্ধ সাকল্য এঁকে প্রশ্ন করলেন, বলুন যাজ্ঞবল্ক, দেবতাদের সংখ্যা কত?

—তিনশো তিন ও তিন হাজার তিন।

—ঠিক। দেবতারা ঠিক কয়জন?

—তেত্রিশ।

—চমৎকার। দেবতারা ঠিক কয়জন?

—ছয়।

—চমৎকার। দেবতারা ঠিক কয়জন?

—তিন।

—চমৎকার। দেবতারা ঠিক কয়জন?

—দুই।

—খুব ভাল। দেবতারা ঠিক কয়জন?

—দেড়।

—চমৎকার। দেবতারা ঠিক কয়জন?

—এক।

—ভাল। এখন বলুন তো সেই তিনশো তিন ও তিন হাজার তিন কারা ?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, দেবতারা মাত্র তেত্রিশ জন। আর সকলে এঁদেরই বিভূতি।

—কারা সেই তেত্রিশ জন ?

—অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—এঁরা মিলে একত্রিশ আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি মিলে তেত্রিশ।

—বলুন তো কারা বসুগণ ?

—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি। এরাই বসুগণ। কেননা নিখিল পদার্থ এঁদেরই মধ্যে নিহিত রয়েছে।

—কেন এঁরা বসু ?

—প্রাণীদের কর্ম ও কর্মফল এঁদের আশ্রিত। দেহের ইন্দ্রিয়ে পরিণত হয়ে জগৎকে এঁরা ধারণ করে আছেন আর নিজেরাও জগতে বাস করছেন। সে কারণে এঁরা বসু।

—রুদ্র কারা ?

—মানবদেহের দশটি ইন্দ্রিয় এবং মন নিয়ে একাদশ। দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে এঁরা আত্মীয়-পরিজনকে রোদন করিয়ে থাকেন। তাই এঁরা রুদ্র।

—আদিত্য কারা ?

—সম্বৎসরের বারোটি মাস। এঁরাই আদিত্য।
—কেন ?
—কারণ, এই সমস্তকে এঁরা আদান করে বলে। তাই তাঁরা আদিত্য।
—ইন্দ্র কে ?
—মেঘগর্জন।
—প্রজাপতি কে ?
—যজ্ঞ।
—কোনটি মেঘগর্জন ?
—বজ্র।
—কোনটি যজ্ঞ ?
—পশুবৃন্দ।
—বজ্র মানে কি ?
—যে বীর্য প্রাণীদের লিটন করে। এটি ইন্দ্রের কাজ। সুতরাং ইন্দ্রই বজ্র।
—যজ্ঞ কাদের দ্বারা সাধিত হয় ?
—পশুগণের দ্বারা।
—কি ছাড়া যজ্ঞের স্বরূপলাভ হয় না ?
—সাধন ছাড়া। তাই পশুগণই যজ্ঞ।
—কারা ছয় জন দেবতা ?
—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আদিত্য এবং দ্যুলোক। এই ছয়জনই সব হয়ে থাকেন। আর সমস্ত দেবতা

এই ছয়জনের অন্তর্ভুক্ত।

—কারণ সেই তিনজন দেবতা ?

—এই তিন লোক।

—কি সেই তিনলোক ?

—ভূলোক অর্থাৎ। পূর্বকণ্ডিকার অগ্নি ও পৃথিবী। দ্বিতীয় হচ্ছে ভুবর্লোক অর্থাৎ বায়ু ও আকাশ। এবং তৃতীয় স্বর্লোক অর্থাৎ সূর্য ও দ্যুলোক। এঁরা সেই তিনজন দেবতা।

—সেই দুইজন দেবতা কারা ?

—অন্ন ও প্রাণ। অন্য দেবতারা এদের অন্তর্ভুক্ত।

—দেড়জন দেবতা কে ?

—যিনি বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়ে থাকেন।

—বায়ু কেন দেড় হলেন ?

—কারণ ইনি আছেন বলেই সমস্ত প্রাণী বেশিরকম বৃদ্ধিশালী হয়। তাই তিনি দেড় অর্থাৎ অর্ধাধিক এক।

—একজন দেবতা কে ?

—প্রাণ, ইনি ব্রহ্মা এবং পণ্ডিতেরা একেই তৎ বলেন, সমস্ত দেবতা এই প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের অন্তর্ভুক্ত। দেবতারা এক ও বহু হয়ে থাকেন। অর্থাৎ এক হিরণ্যগর্ভই এক ও অনন্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

সাকল্য এবার বললেন, শুনুন যাজ্ঞবল্ক্য, পৃথিবী যাঁর

আশ্রয়, অগ্নি যাঁর দর্শনেন্দ্রিয়, মনের দ্বারা যিনি সঙ্কল্প বিকল্প করেন, সমস্ত দেহের ইন্দ্রিয় সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, একমাত্র তিনিই পণ্ডিত।

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, যাবতীয় দেহেন্দ্রিয়ের একমাত্র গতি সেই পুরুষকে আমি জানি।

—বেশ। তাহলে বলুন কে তাঁর দেবতা ?

—অমৃত।

—কামই যাঁর আশ্রয়, বুদ্ধি যাঁর দর্শনেন্দ্রিয়, মনের দ্বারা যিনি সঙ্কল্প বিকল্প করেন, দেহের সকল ইন্দ্রিয়ের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, একমাত্র তিনিই পণ্ডিত।

—আমি সেই পুরুষকে অবশ্যই জানি। যিনি কামময়, তিনি সেই পুরুষ।

—কে তাঁর দেবতা ?

—নারী। কামের উদ্দীপক বলে নারী কামের দেবতা।

—রূপ যাঁর আশ্রয়, চোখ যাঁর দর্শনেন্দ্রিয়, মনের দ্বারা যিনি সঙ্কল্প বিকল্প করেন, দেহের সকল ইন্দ্রিয়ের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনিই পণ্ডিত।

—আমি সেই পুরুষকে জানি। আদিত্যে যিনি অবস্থান করেন, তিনি সেই পুরুষ।

—কে তাঁর দেবতা ?

—সত্য।

—আকাশ যাঁর আশ্রয়, শ্রোত্র যাঁর দর্শনেন্দ্রিয়, মনের দ্বারা যিনি সঙ্কল্প বিকল্প করেন, দেহের সকল ইন্দ্রিয়ের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই পণ্ডিত।

—আমি তাঁকে জানি।

—কে তাঁর দেবতা ?

—সমস্ত দিক্।

—অন্ধকার যাঁর আশ্রয় বুদ্ধি যাঁর দর্শনেন্দ্রিয়, মনের দ্বারা যিনি সঙ্কল্প বিকল্প করেন, দেহের সকল ইন্দ্রিয়ের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই পণ্ডিত।

—আমি তাঁকে জানি। যিনি ছায়াময়, তিনি সেই পুরুষ।

—কে তাঁর দেবতা ?

—মৃত্যু।

—যাবতীয় রূপ যার আশ্রয়, চোখ যাঁর দর্শনেন্দ্রিয়, মনের দ্বারা যিনি সঙ্কল্প বিকল্প করেন, দেহের সকল ইন্দ্রিয়ের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই পণ্ডিত।

—আমি তাঁকে জানি। আদর্শে অর্থাৎ দর্পণে যিনি অভিমানী, তিনি সেই পুরুষ।

—কে তাঁর দেবতা ?

—প্রাণ।

—শুক্র অর্থাৎ রেতঃ যাঁর আশ্রয়, বুদ্ধি যাঁর দর্শনেন্দ্রিয়

মনের দ্বারা যিনি সঙ্কল্প বিকল্প করেন, দেহের সকল ইন্দ্রিয়ের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই পণ্ডিত।

—আমি তাঁকে জানি।

—কে তাঁর দেবতা ?

—প্রজাপতি।

এই উত্তর শুনে সাকল্য চুপ করে রইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য হেসে বললেন, আচ্ছা সাকল্য, আপনি অনর্থক অন্যদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আমার তেজে পুড়ছেন।

সাকল্য বিরক্ত হয়ে বললেন, নিজেকে আপনি এতবড় ব্রহ্মজ্ঞ মনে করেন ?

—একথা কেন বলছেন ?

—কুরু ও পাঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা দেখাতেও আপনার আটকাচ্ছে না ?

—আমি তো অবজ্ঞা করি নি। আমি শুধু আপনাকে সাবধান করেছি।

—আচ্ছা বলুনতো, এই পূর্বদিকে আপনি কোন দেবতার সঙ্গে একীভূত ?

—আদিত্যের সঙ্গে।

—সেই আদিত্য কিসে প্রতিষ্ঠিত ?

—চোখে।

—চোখ কিসে প্রতিষ্ঠিত ?

—রূপে। কারণ চোখের সাহায্যে লোকে রূপ দর্শন করে।
—রূপ কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—হৃদয়ে। কেননা হৃদয়ের সাহায্যে লোকে রূপ জানে। তাই হৃদয়েই রূপ প্রতিষ্ঠিত।
—ঠিক বলেছেন। আচ্ছা বলুন তো এই দক্ষিণদিকে আপনি কোন দেবতার সঙ্গে একীভূত?
—যম দেবতার সঙ্গে।
—সেই যম কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—যজ্ঞে।
—যজ্ঞ কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—শ্রদ্ধায়। শ্রদ্ধাবান হলে লোকে দক্ষিণা দেয়।
—শ্রদ্ধা কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—হৃদয়ে। হৃদয়ের দ্বারা লোকে শ্রদ্ধাকে জানে।
—ঠিক বলছেন। আচ্ছা বলুন, পশ্চিমদিকে আপনি কোন দেবতার সঙ্গে একীভূত?
—বরুণ দেবতার সঙ্গে।
—সেই বরুণ কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—জলে।
—জল কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—শুক্রে।
—শুক্র কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—হৃদয়ে।

—এবার বলুন, উত্তর দিকে আপনি কোন দেবতার সঙ্গে একীভূত?
—সোম দেবতার সঙ্গে।
—সোম কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—দীক্ষাতে।
—দীক্ষা কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—সত্যে। সত্যেই দীক্ষা প্রতিষ্ঠিত।
—সত্য কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—হৃদয়ে!
—আচ্ছা বলুন ধ্রুব অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দিকে আপনি কোন দেবতার সঙ্গে একীভূত?
—অগ্নি দেবতার সঙ্গে।
—অগ্নি কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—বাগিন্দ্রিয়ে।
—বাক্ কিসে প্রতিষ্ঠিত?
—হৃদয়ে।
—হৃদয় কিসে প্রতিষ্ঠিত?
যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, তুমি যদি মনে কর, এই হৃদয় দেহ থেকে অন্যত্র থাকে, আর যদি সত্যিই হৃদয় অন্যত্র থাকে, তবে কুকুরে এই দেহ ভক্ষণ করবে কিংবা পাখি একে ছিন্নভিন্ন করবে। হৃদয় দেহে না থাকলে দেহের মৃত্যু ঘটবে। বলতে হবে, হৃদয় দেহে প্রতিষ্ঠিত। আবার

নাম, রূপ এবং কর্মের অতিরিক্ত নয় বলে দেহও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

—শরীর এবং হৃদয় কিসে প্রতিষ্ঠিত?

—প্রাণে।

—প্রাণ কিসে প্রতিষ্ঠিত?

—ব্যানে।

—ব্যান কিসে প্রতিষ্ঠিত?

—সমানে। অপানবৃত্তি প্রাণবৃত্তিকে টেনে না রাখলে সেটি বেরিয়ে যাবে। আবার ব্যান মধ্যে থেকে এদের ধরে না রাখলে অপান নিচের দিকে ও প্রাণ সামনের দিকে বেরিয়ে যাবে। এবং এই তিনটি বায়ু যদি উদ্যানে না থাকে, তাহলে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এই চারটি বায়ু আবার সামনে নিবদ্ধ। যাঁকে 'নেতি', 'নেতি' বলা হয়েছে, তিনিই এই আত্মা। ইনি কখনো গৃহীত হন না, তাই ইনি অগ্রহণীয়। ইনি কখনো ক্ষীণ হন না, তাই ইনি অক্ষয়। কখনো আসক্ত হন না বলে ইনি অসঙ্গ। ব্যথিত হন না বলে অবদ্ধ। শুনুন সাকল্য, আটটি আশ্রয়, আটটি দর্শনেন্দ্রিয়, আটটি দেবতা ও আাট পুরুষের কথা বলা হলো। আমি এবার আপনাকে প্রশ্ন করব। যিনি পুরুষদের বার করে আনেন এবং উপসংহৃত করেন অথচ উপাধি ধর্মকে অতিক্রম করে বিদ্যমান আছেন, শুধুমাত্র উপনিষদ থেকেই সে পুরুষকে

জানা যায়—আমি তাঁর কথা জিজ্ঞেস করছি। যদি না বলতে পারেন, তাহলে আপনার মস্তক নিপতিত হবে। সাকল্য সেই পুরুষকে জানতেন না। কাজেই তাঁর মস্তক নিপতিত হলো।

যাজ্ঞবল্ক্য এবার অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বললেন, ইচ্ছে করলে আপনারা যে কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, কিংবা আপনারা কেউ যদি চান, আমি তাহলে প্রশ্ন করতে পারি। উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা সকলেই চুপ করে রইলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য এবার সকলকেই কিছু শ্লোকের সাহায্যে প্রশ্ন করলেন। বললেন, এতো সকলেই জানেন, মানুষের দেহ বনস্পতি বৃক্ষের মতো। পুরুষের গায়ের লোম গাছের পাতার মতো আর ত্বক গাছেব বল্কলের মতো। মানুষের ত্বক থেকে বেরিয়ে আসে রক্ত আর গাছের বল্কল থেকে বেরিয়ে আসে গাছের রস। মানুষের মাংস গাছের অন্তর্বল্কল। স্নায়ু অন্তরতম বল্কল। অন্তরের অস্থিগুলি কাঠ। গাছ যদি কাটা হয়, আবার সে অভিনবভাবে মূল থেকে বেরিয়ে আসে। মানুষ যদি মৃত্যুকবলিত হয়, কোন মূল থেকে সে আবার আবির্ভূত হয়। শুক্রই সেই মূল, একথা নিশ্চয়ই আপনারা বলবেন না। কেননা জীবিত মানুষ থেকেই শুক্র জন্মায়। গাছকে একেবারে মূল থেকে উৎপাটিত করলে সেটি আর জন্মায় না। কে তাঁকে পুনর্বার জন্ম দিতে পারেন ?

যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রশ্নের উত্তর সমাগত ব্রাহ্মণদের একজনও

দিতে পারলেন না। সুতরাং অনায়াসে তিনি সমস্ত গাভী নিয়ে চলে গেলেন।

একবার বিদেহ সম্রাট জনক রাজসভায় বসে ছিলেন। এমন সময় যাজ্ঞবল্ক্য সেখানে এলেন।

সম্রাট জনক জিগ্যেস করলেন, কি প্রয়োজনে এসেছেন যাজ্ঞবল্ক্য? কি চাই আপনার? পশু? না কি আত্ম-বিষয়ক প্রশ্ন?

যাজ্ঞবল্ক্য হেসে বললেন, ঠিক ধরেছেন সম্রাট। আমি দুটোর জন্যেই এসেছি। জনক হাসতে হাসতে বললেন, বেশ তো! বলুন না, আপনি কি জানতে চান?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমি শুনতে চাই, আপনি কোন আচার্যের কাছে কি উপদেশ পেয়েছেন?

—জিত্বা শৈলিনি আমাকে বলেছিলেন, বাক্‌দেবতাই ব্রহ্ম।

—শৈলিনি কি আপনাকে বলেছেন, সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় কি?

—না তো। সেসব কিছু আমাকে বলেন নি। আপনি আমাকে বলুন।

—বাগিন্দ্রিয়ই শরীর। অব্যাকৃতই আশ্রয়। এঁকেই প্রজ্ঞা বলে উপাসনা করা উচিত।

—কাকে প্রজ্ঞা বলে যাজ্ঞবল্ক্য?

—সম্রাট, বাগিন্দ্রিয়ই সেই প্রজ্ঞা। বাক্যের সাহায্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, প্রভৃতি

জানা যায়। জানা যায় ইহজন্ম ও পরজন্ম এবং নিখিল প্রাণিবৃন্দ। বাগিন্দ্রিয়ই পরম ব্রহ্ম। এভাবে যিনি ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, বাগিন্দ্রিয় তাঁকে ত্যাগ করে না। দেবতা হয়ে তিনি আর সকল দেবতাকে পান।

জনক বললেন, বিশাল-বিশাল ষাঁড়সহ এক হাজার গাভী আপনাকে আমি দান করছি।

—আর কোন আচার্য কি বলেছেন বলুন?

জনক বললেন, উদঙ্ক শৌল্বায়ন আমাকে বলেছেন, প্রাণই ব্রহ্ম।

—সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় তিনি আপনাকে বলেছেন কি?

—নাঃ। সেসব কিছু বলেন নি।

—তাহলে জেনে রাখুন প্রাণই শরীর এবং অব্যাকৃতই আশ্রয়। একে প্রিয় বলে উপাসনা করা উচিত।

—কে প্রিয় যাজ্ঞবল্ক্য?

—সম্রাট, প্রাণই প্রিয়। প্রাণ রক্ষার জন্যই লোকে অগ্রহণীয় দান গ্রহণ করে। নিহত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও শুধুমাত্র প্রাণধারণের জন্য লোকে সেদিকেই যায়। প্রাণই পরম ব্রহ্ম। এইভাবে যিনি ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, প্রাণ কখনো তাঁকে ত্যাগ করে না।

জনক খুশী হয়ে বললেন, হাতীর মত বিশাল-বিশাল ষাঁড় সহ একহাজার গাভী আপনাকে দান করলাম। যাজ্ঞবল্ক্য এবার জিজ্ঞেস করলেন, আর কোন আচার্য কি বলেছেন শুনি।

—বকু´ বাষ্ণ´ আমাকে বলেছেন, চোখই ব্রহ্ম।

—সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় তিনি আপনাকে বলেছেন কি ?

—সেসব কিছু বলেন নি।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ই শরীর, আকাশ প্রতিষ্ঠা। একে সত্য বলে উপাসনা করা উচিত।

—কাকে সত্য বলে যাজ্ঞবল্ক্য ?

—চক্ষুরিন্দ্রিয়ই সত্য সম্রাট। স্বচক্ষে কিছু দেখলে লোকে যখন জিজ্ঞেস করে, তুমি দেখেছ কি ? সে তখন উত্তর দেয়, হ্যাঁ আমি দেখেছি। হে সম্রাট, চক্ষুই পরম ব্রহ্ম। এভাবে যিনি ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, চক্ষু তাকে ত্যাগ করে না।

জনক খুশী হয়ে বললেন, বিশাল-বিশাল হাতীর মতো ষাঁড় সহ একহাজার গাভী আপনাকে দান করলাম।

—আর কোন আচার্য কি বলেছেন শুনি ?

—গর্দভীবিপীত ভরদ্বাজ আমাকে বলেছেন, শ্রোত্রই ব্রহ্ম।

—সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় তিনি আপনাকে বলেছেন ?

—সেসব কিছু বলেন নি।

—শ্রবণেন্দ্রিয়ই শরীর, আকাশ প্রতিষ্ঠা। একে অনন্ত বলে উপাসনা করা উচিত। সমস্ত দিক্ অনন্ত। আবার সমস্ত দিক্ই শ্রোত্র। শ্রোত্রই পরম ব্রহ্ম সম্রাট। এভাবে যিনি ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, শ্রবণেন্দ্রিয় তাকে ত্যাগ

করে না।

জনক খুশী হয়ে বললেন, হাতীর মত বিশাল-বিশাল ষাঁড়সহ একহাজার গাভী আপনাকে দান করলাম।

—আর কোন্ আচার্য কি কি বলেছেন, শুনি ?

—সত্যকাম জাবাল আমাকে বলেছেন, মনই ব্রহ্ম।

—সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় কি সে সম্পর্কে কিছু আপনাকে বলেছেন কি ?

—না। সে সম্পর্কে কিছু আমাকে বলেন নি।

—মনই শরীর। আকাশই তাঁর প্রতিষ্ঠা। এঁকে আনন্দ বলে উপাসনা করা উচিত।

—কাকে আনন্দ বলে যাজ্ঞবল্ক্য ?

—সম্রাট, মনই আনন্দ। মনের দ্বারা মানুষ স্ত্রীকে প্রার্থনা করে। সেই স্ত্রীর গর্ভে অনুরূপ পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্র আনন্দের কারণ। মনে রাখবেন সম্রাট, মনই পরম ব্রহ্ম। এভাবে যিনি উপাসনা করেন, মন তাঁকে ত্যাগ করে না।

জনক প্রীত হয়ে বললেন, হাতির মতো বিরাট বিরাট ষাঁড় সহ এক হাজার গাভী আপনাকে দান করলাম।

—আর কোন আচার্য কি বলেছেন, শুনি।

—বিদগ্ধ সাকল্য আমাকে বলেছেন, হৃদয়ই ব্রহ্ম।

—সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় সম্পর্কে তিনি কিছু বলেছেন কি ?

—না। সে-সব কিছু বলেন নি।

—হৃদয়ই তাঁর বাসস্থান, আকাশ আশ্রয়। এঁকে স্থিতি বলে উপাসনা করা উচিত।

—কাকে স্থিতিত্ব বলে?

—মনে রাখবেন সম্রাট, হৃদয়ই সর্বভূতের আশ্রয়। হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। এইভাবে যিনি ব্রহ্মের উপাসনা করেন, হৃদয় তাঁকে ত্যাগ করে না।

জনক আনন্দিত হয়ে বললেন, হাতির মতো বিশাল-বিশাল ষাঁড়সহ এক হাজার গাভী আপনাকে দান করলাম।

সম্রাট জনক একবার কুর্চ থেকে যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনাকে নমস্কার যাজ্ঞবল্ক্য। আমাকে উপদেশ দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য হেসে বললেন, সম্রাট এতদিন আপনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন। আবার বিপুল ধনসম্পদও লাভ করেছেন। পড়াশুনোও করেছেন প্রচুর। কিন্তু আপনি কি জানেন, দেহ থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি জানি না যাজ্ঞবল্ক্য।

—তাহলে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি।

—বলুন।

—ডান চোখে অবস্থিত যে পুরুষ, তাঁর নাম ইন্ধ। পরোক্ষভাবে এঁকে ইন্দ্র বলা হয়। এর কারণ দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় ও প্রত্যক্ষদ্বেষী। ইনিই বৈশ্বানর আত্মা। উপাসনার দ্বারা আপনি এঁর সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেছেন।

—তারপর?

—বাঁ চোখে রয়েছেন এঁর পত্নী বিরাট্।

—এঁদের মিলনভূমি কোনটি?

—হৃদপিণ্ডের মধ্যে যে আকাশ, সেটি এঁদের মিলনভূমি। হৃদয়ের যে রক্তপিণ্ড, সেটি এঁদের অন্ন। হৃদপিণ্ডের যে জালাকার অংশ, সেটি এঁদের আবরণ। বহু বিভক্ত কেশের মতো, যেসব নাড়ী হৃদয় থেকে ওপর দিকে উঠে রয়েছে, সেটি এঁদের সঞ্চরণমার্গ। হৃদপিণ্ডে আরোপিত রয়েছে হিতা নামে অজস্র নাড়ী। সঞ্চারিত অন্নরস এসব অবলম্বন করে যায়।

পূর্বদিক তাঁর পূর্ববর্তী প্রাণ, দক্ষিণ দিক দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক উত্তর প্রাণ, সমস্ত দিক সমস্ত প্রাণ, নেতি নেতি, যাঁকে বলা হয়েছে, তিনিই এই আত্মা। গৃহীত হন না বলেই ইনি অগ্রহণীয়। ক্ষয় হন না বলেই ইনি অক্ষয়। আসক্ত হন না বলেই ইনি অসঙ্গ। ব্যথিত

ও বিনষ্ট হন না বলেই ইনি অবধ্য।
জনক কৃতার্থ হয়ে বললেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই বিদেহ সাম্রাজ্য আপনার হল এবং আমিও আপনার হলাম।
যাজ্ঞবল্ক্য জনকের কাছে গেলেন। এবার জনকই তাঁকে প্রশ্ন করলেন। আসলে এর আগে, একসময়ের দুজনে যখন অগ্নিহোত্র বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য রাজাকে বর দিতে চেয়েছিলেন। রাজার প্রার্থনা ছিল,

তিনি যেন ইচ্ছেমতো যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে পারেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে সেই বর দিয়েছিলেন। সেই কারণে এবার তিনি তাঁকে প্রথমে প্রশ্ন করলেন। জনক বললেন, কোন্ জ্যোতি পুরুষের সহায়ক হয়? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, আদিত্য জ্যোতি। সূর্যালোকের সাহায্যেই বসে, বাইরে যায়, কাজ করে এবং ফিরে আসে।
জনক বললেন, ঠিক উত্তরই দিয়েছেন। আচ্ছা বলুন তো, সূর্য অস্তমিত হলে, কোন্ জ্যোতি এই পুরুষের সহায়ক হয়?

—চন্দ্রই তাঁর জ্যোতি। চন্দ্রলোকের সাহায্যেই সে বসে, বাইরে যায়, কাজ করে, ফিরে আসে।

—ভালো। এবার বলুন তো সূর্য অস্তমিত হলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হলে কোন্ জ্যোতি এই পুরুষের সহায়ক হয়?

—অগ্নি তখন তার জ্যোতি। অগ্নিপ্রভার সাহায্যেই সে বসে, বাইরে যায়, কাজ করে, ফিরে আসে।

—ভালো। এবার বলুন তো সূর্য অস্তমিত হলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হলে কোন্ জ্যোতি এই পুরুষের সহায়ক হয়?

—অগ্নি তখন তার জ্যোতি। অগ্নিপ্রভার সাহায্যেই সে বসে, বাইরে যায়, কাজ করে, ফিরে আসে।

—আচ্ছা বেশ। এখন বলুন সূর্য ও চন্দ্রমা অস্তমিত হলে এবং অগ্নি নির্বাপিত হলে কোন্ জ্যোতি তাঁর সহায়ক হয়?

—শব্দই তাঁর জ্যোতি হয়। শব্দজ্যোতির সাহায্যেই সে বসে, চলে, কাজ করে, ফিরে আসে। এইজন্যে দারুণ অন্ধকারেও শুধুমাত্র শব্দ অনুসরণ করে লোকে সেখানে উপস্থিত হতে পারে।

—ঠিকই বলেছেন যাজ্ঞবল্ক্য। এবার বলুন তো সূর্য, চন্দ্রমা অস্তমিত হলে, অগ্নি নিভে গেলে, শব্দ নিরুদ্ধ হলে কোন্ জ্যোতি মানুষের সহায়ক হয়?

—আত্মাই তাঁর জ্যোতি হয়ে থাকে। আত্মজ্যোতির সাহায্যেই সে বসে, চলে, কাজ করে, ফিরে আসে।

—আত্মা কোন্‌টি?

—যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়দের মধ্যে অবস্থিত এবং বুদ্ধির একেবারে ভেতরে অবস্থিত স্বয়ং জ্যোতি পুরুষ। তিনি ইহলোক ওপরলোকের মধ্যে বিচরণ করে আবার স্বপ্নে উপহিত হয়ে অবিদ্যার পরিণামস্বরূপ এই জগৎকে অতিক্রম করেন। জাগরণে যিনি বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করেন এবং স্বপ্নেও যিনি বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করেন তিনিই আত্মা। কেননা তিনি বুদ্ধি থেকে ভিন্ন এবং চির শুদ্ধ। সেই প্রত্যাগাত্মা শরীর ধারণের সময় দেহেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। দেহেন্দ্রিয় হচ্ছে অনিষ্ট রাশি। মৃত্যুর সময়ে তিনি ওই অনিষ্ট রাশি ত্যাগ করেন। দুটি মাত্র তাঁর স্থান। ইহলোক ও পরলোক। স্বপ্ন হচ্ছে তৃতীয় স্থান। সেটি হচ্ছে সংযোগ ক্ষেত্র। সেই প্রত্যাগাত্মা সংযোগ ক্ষেত্রে অবস্থিত থেকে ইহলোক ও পরলোক দুটি ক্ষেত্রকেই দেখেন। পরলোকের জন্যই তিনি জ্ঞান, কর্ম এসব সাধন সঞ্চয় করেছেন। সেগুলিকে আশ্রয় করেই তিনি পাপফল ও পুণ্যফল দর্শন করেন। তিনি যখন স্বপ্ন দর্শন করেন, দেহকে বিনাশ করে স্বপ্নদেহ নির্মাণ করে। নিজস্ব জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত স্বপ্নদর্শন তাঁর হয়। সে অবস্থায় প্রত্যাগাত্মা স্বয়ং জ্যোতি হন। সেখানে রথ নেই, অশ্ব নেই, পথ নেই। অথচ যিনি রথ, অশ্ব এবং সমস্ত পথ সৃষ্টি করেন। সেখানে সাধারণ আনন্দ নেই, বিশেষ আনন্দ নেই

এমন কি সন্তান লাভজনিত আনন্দও নেই। অথচ তিনি সেখানে এই সবই সৃষ্টি করেন। সেখানে পুকুর নেই, দীঘি নেই কিংবা নদী নেই। অথচ তিনি এই সবই সৃষ্টি করেন। স্বপ্নের অনুভূতির জন্য যে আলোর প্রয়োজন হয় সেটি আত্মার আলো। কেননা সেখানে ইন্দ্রিয় বা সূর্য চন্দ্র নেই। আত্মা স্বয়ং জ্যোতি। সমস্ত কর্মফলের হেতু। তাঁর জ্যোতির প্রভাবেই দেহেন্দ্রিয় কাজে লিপ্ত হয় বলে আত্মাতে আমরা কর্তৃত্ব আরোপ করি। আত্মা জ্যোতির্ময়। একাকী তিনি সঞ্চার করেন। তিনি সর্বদা অসুপ্ত। স্বপ্নাবস্থায় আমাদের বাসনাময় বিষয়গুলিকে তিনিই প্রকাশ করেন আবার ফিরে আসেন জাগ্রত অবস্থায়। সেই অমর পূর্ণাত্মা স্বপ্নের বহু কামনা বাসনার বিষয় নির্মাণ করেন। বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন, বহু স্ত্রী সঙ্গ করেন অথবা ভীষণ-ভীষণ সমস্ত দৃশ্য দর্শন করেন। বহু রকম লীলা তিনি করে থাকেন। বহু ক্রীড়া করে থাকেন। লোকে এই সবই দেখে। কিন্তু কেউ তাঁকে দেখে না। বলুন তো রাজা, কেন লোকে বলে অমুকের দেহে দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে?

রাজা উত্তর দিলেন, জানি না।

—যদি ইনি অর্থাৎ এ আত্মা কোন ইন্দ্রিয়কে যথাযথ ভাবে প্রাপ্ত না হন, তাহলে দেহে দুরারোগ্য ব্যাধি

হয়েছে বলতে হবে।

জনক বললেন, আমি আপনাকে এক হাজার দুগ্ধবতী গাভী দান করছি। এ বিষয়ে আরো কিছু আমাকে বলুন।

জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, আপনি এই গাভীগুলো নিন।

—তাহলে শুনুন। স্বপ্নে এই আত্মা সুখভোগ করেন, বিচরণ ফল ভোগ করেন এবং পাপপুণ্যের ফল দর্শন করে সুষুপ্তাবস্থায় অবস্থান করার পরে আবার আগের স্বপ্নে ফিরে আসেন। অসঙ্গ বলে তাকে কোনো কিছু স্পর্শ করে না।

—ঠিকই বলেছেন যাজ্ঞবল্ক্য। আমি ধন্য বোধ করছি।

আরো এক হাজার দুগ্ধবতী গাভী আপনাকে দান করলাম। আপনি আমাকে আরো উপদেশ দিন।

—স্বপ্নদেহের কোনো ইন্দ্রিয় নেই, স্বপ্নের কোনো দেহেন্দ্রিয় নেই। যে কারণে আত্মার কোন ক্রিয়াও নেই। পাপ বা পুণ্য স্বপ্নে কিছুই অর্জিত হয় না। সেই পুরুষ স্বপ্নাবস্থা এবং জাগ্রতবস্থা দুটি অবস্থাতেই বিচরণ করেন। ঠিক যেন মহামৎস্য পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি কূলেই সমানভাবে ঘুরে বেড়ায়। যেমন কোনো বাজপাখি আকাশে উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত দুই পাখা ছড়িয়ে তার নীড়ের দিকে ফিরে চলে ঠিক সেইরকম এমন একটি অবস্থার দিকে এই আত্মা ধাবিত হন যেখানে লুপ্ত অবস্থায় তাঁর কোন কাম থাকে না কিংবা তিনি কখনও কোনো স্বপ্ন দর্শন করেন না আসলে আমরা স্বপ্নেও অবিদ্যার বশীভূত হয়ে থাকি। তাই স্বপ্নে আমরা ভয় পাই, স্বপ্নে আমরা অসহায় বোধ করি। কিন্তু যখন অবিদ্যার প্রভাব নির্বাপিত হয়, তখন আমরাই স্বপ্নে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছোই যখন মনে হয়, আমিই চৈতন্য, আমিই পরিপূর্ণ। মনে রাখবেন সম্রাট, অবিদ্যা কিন্তু আত্মার ধর্ম নয়।

—আমাকে আরো বলুন যাজ্ঞবল্ক্য।

—প্রিয়া পত্নীর সঙ্গে আলিঙ্গিত পুরুষ যেমন স্ত্রী ছাড়া সেই পরম আনন্দের মুহূর্তে আর কিছুই বোঝে না, আর কিছুই

জানে না, আর কিছু জানতে চায়ও না, সেই অসাধারণ মুহূর্তগুলিতে প্রিয়তমা পত্নী ছাড়া তাঁর কাছে আর সমস্তই অলীক এবং অসত্য ঠিক সেইরকম প্রত্যগাত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হন, যখন তিনি একীভূত হন, সেই সময়ে ভিতর বা বাহির কোনো কিছুই তাঁকে আর স্পর্শ করে না। সেই মিলন অবস্থা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। এই যে রূপ, এটি আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম এবং শোকহীন। তিনি তখন সমস্ত শোক কামের অতীত। জেনে রাখুন সম্রাট, অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ যেমন অভিন্ন, সেইরকম আত্মা ও আত্মার জ্যোতি অভিন্ন। তখন তিনি আঘ্রাণ করেও আঘ্রাণ করেন না। রসাস্বাদ করেও রসাস্বাদ করেন না, বক্তা হয়েও বক্তা হন না, শ্রোতা হয়েও শ্রোতা হন না, চিন্তা করেও চিন্তা করেন না, স্পর্শ করেও স্পর্শ করেন না, জেনেও জানেন না। কেননা তখন তিনি পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে রয়েছেন। তাঁর নিজের কোনো অস্তিত্ব তখন আর নেই। তিনি তখন এক, জলের মতো স্বচ্ছল, দ্রষ্টা, অদ্বৈত। শুনুন সম্রাট, এই হচ্ছে ব্রহ্মরূপ লোক, জীবের পরম গতি। তাঁর পরম আনন্দ। এই আনন্দের সামান্যতম অংশ অবলম্বন করে জীবগণ জীবন ধারণ করেন। আরো শুনে রাখুন, মানুষদের মধ্যে যা একশো আনন্দ, পিতৃগণের সেটি একটি আনন্দ। আবার পিতৃগণের একশো আনন্দ গন্ধর্বলোকের সেটি একটিই

আনন্দ। আবার গন্ধর্বলোকের একশো আনন্দ দেবগণের একটি আনন্দ। এই দেবতারা কর্মের ফলেই দেহত্ব অর্জন করেছেন। আবার এই কর্মদেবগণের একশো আনন্দ আজানদেবগণের একটি আনন্দ। আজানদেবগণের একশো আনন্দ প্রজাপতিলোকের একটি আনন্দ। প্রজাপতিলোকের একশো আনন্দ হিরণ্যগর্ভের একটি আনন্দ। এটিই পরম আনন্দ।

জনক বললেন, আমি আপনাকে একহাজার দুগ্ধবতী গাভী দান করছি। আমাকে যুক্তি বিষয়ে আরো বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য এবার একটু চিন্তায় পড়লেন। তিনি ভাবলেন, আমি এঁকে একটিমাত্র ইচ্ছাবর দিয়েছি। কিন্তু এখন আমি যা বলছি, সেটিকেই ইনি মুক্তি বিষয়ক প্রশ্নের আংশিক মীমাংসা বলে ধরে নিয়ে আমাকে আবার প্রশ্ন করছেন। এইভাবে একটি মাত্র বরের সাহায্যে উনি আমাকে দিয়ে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়ে নিচ্ছেন। এ তো মহা মুস্কিল হলো! বুঝতে পারছি, এই রাজা সত্যিই অসম্ভব মেধাবী!

রাজা আবার জানতে চাইলেন, আমাকে মুক্তি বিষয়ে আরো বলুন যাজ্ঞবল্ক্য।

—সেই প্রত্যগাত্মা সুষুপ্তির পরে সুখ ও বিচরণফল ভোগ করে আবার আগের জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসেন। খুব ভারবাহী শকট যেমন শব্দ করতে করতে যায়, ঠিক

সেইরকম দেহে অবস্থিত জীবাত্মা দেহ ছেড়ে বেরোনোর সময় পরমাত্মার সঙ্গে অধিষ্ঠিত হয়ে শব্দ করতে করতে যান। দেহ যখন কৃশ হয়ে আসে কিংবা জরা অথবা রোগের দ্বারা শীর্ণ হয়, সেসময় সুষুপ্তিতে প্রাণের সাহায্যে দেহ রক্ষিত হয়। কিন্তু মৃত্যুতে প্রাণ লিঙ্গাত্মার সঙ্গে চলে যান।

মনে রাখবেন, আত্মাতে কোনো ক্রিয়া না থাকলেও বুদ্ধি ইত্যাদির বিক্ষেপবশতঃ নানা ধরনের ক্রিয়া তাতে আরোপিত হয়। এই কারণে দেহের দুর্বলতা ও সংজ্ঞা-হীনতাকে বলা যায় আত্মার দুর্বলতাও সংজ্ঞাহীনতা। যখন চোখের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবতা সব দিক থেকে পরাঙ্মুখ হন, মুমূর্ষু মানুষের আর জ্ঞান ফেরে না। আদিত্যের অংশবিশেষই চোখের দেবতা। কর্মফলের দরুন যতদিন জীবের দেহ থাকে, এই দেবতা ঠিক ততদিন চোখে অনুগ্রাহক হিসেবে থাকেন। জীবের কর্মফল শেষ হলে তিনি জীবদেহ ত্যাগ করে আদিত্যপুরুষের সঙ্গে মিলিত হন। অন্যান্য ইন্দ্রিয়দেবতার সম্পর্কেও ঠিক এইরকম বুঝতে হবে। চোখ যখন একীভূত হয়, লোকে বলে ইনি আর দেখতে পাচ্ছেন না। যখন ঘ্রাণেন্দ্রিয় একীভূত হয়, লোকে বলে ইনি আর আঘ্রাণ করছেন না। যখন রসনা একীভূত হয়, লোকে বলে ইনি আর কোনো স্বাদ পাচ্ছেন না, যখন বাক্ একীভূত হয়, লোকে বলে

আর ইনি কথা বলছেন না। যখন শ্রবণ একীভূত হয়, লোকে বলে ইনি আর কানে শুনছেন না। যখন মন একীভূত হয়, লোকে বলে ইনি আর চিন্তা করছেন না। যখন ত্বক্ একীভূত হয়, লোকে বলে ইনি আর স্পর্শ করছেন না। যখন বুদ্ধি একীভূত হয়, লোকে বলে ইনি আর কিছু জানছেন না। চোখ, ব্রহ্মরন্ধ্র বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে জীবাত্মা, পরম জ্যোতি অবলম্বন করে বেরিয়ে যান। তিনি বেরিয়ে এলে প্রাণও বেরিয়ে আসে। প্রাণ বেরিয়ে এলে অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয় বেরিয়ে আসে। স্বর্ণকার যেমন খানিকটা স্বর্ণ দিয়ে সেটিকে আরো সুন্দর মনোহর করে তোলে, ঠিক সেইরকম জীব এই শরীরকে ত্যাগ করে, একে বিচেতন করে পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক, ব্রহ্মলোক কিংবা অন্যান্য জীবের উপযোগী সুন্দর ও মনোহর দেহান্তর তৈরি করেন। যিনি আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্মময়, অধর্মময়, সর্বময়। তিনি যেমন কামনাবান হন, ঠিক সেইরকম কৃতসঙ্কল্প হন। যেমন কৃতসঙ্কল্প হন, ঠিক সেইরকম কাজ করেন। যেমন কাজ করেন, ঠিক সেইরকম ফল সম্পাদন করেন। কেউ কেউ বলেন পাপ পুণ্য সংসারের কারণ। কিন্তু তা নয়

আসলে কামই সংসারের মূল। নিষ্কাম কর্ম বস্তুতঃ ফলারম্ভক হয় না। এ বিষয়ে একটি মন্ত্রে বলা আছে, ইহলোকে যা কিছু কর্ম করেন, পরলোকে সেই কর্মের ভোগ শেষ করে আবার কর্ম করার জন্য পরলোক থেকে ইহলোকে আসেন। শুনে রাখুন সম্রাট, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের এইরকম হয়। কিন্তু যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম এবং আত্মকাম—তাঁর ইন্দ্রিয়েরা বেরিয়ে যায় না। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ বলে ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। আরেকটি মন্ত্রে বলা আছে, মানুষের বুদ্ধিতে যত তৃষ্ণা আশ্রিত হয়ে রয়েছে, যখন সেগুলি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মানুষ তখন অমর হয়। জীবদেহে উদ্ভাসিত হয় ব্রহ্মভাব। তখন তিনি অশরীর, অমৃত, প্রাণ, তেজ ও স্বয়ং ব্রহ্ম। জনক অসম্ভব কৃতার্থ হয়ে বললেন, প্রিয় যাজ্ঞবল্ক্য, আমি আপনাকে এই উপদেশের জন্য এক হাজার দুগ্ধবতী গাভী দান করছি। আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন সর্বস্ব দান না করে কেন আমি এক হাজার করে গাভী দান করছি।

যাজ্ঞবল্ক্য হাসিমুখে বললেন, আমি জানি। আসলে আত্ম-জ্ঞানের সাধন এবং আত্মজ্ঞানের অঙ্গীভূত সমস্ত বাসনা—ত্যাগস্বরূপ সন্ন্যাসের উপদেশ আপনাকে এখনো আমি দিইনি। অথচ সেটি শোনার ইচ্ছে আপনার যথেষ্টই আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে রাজা জনক ধন্য বোধ

করলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলতে লাগলেন, সূক্ষ্ম, বিস্তীর্ণ, মোক্ষমার্গ ব্রহ্মজ্ঞের দ্বারা মানুষ লাভ করে। সেই মার্গ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, সেটি সাদা, নীল, পিঙ্গল, সবুজ কিংবা লাল। আসলে এঁদের সকলের দৃষ্টি সসীম। তাই এঁরা ভ্রান্ত। এঁরা বহু বর্ণের আধার সূর্যকেই মোক্ষমার্গ মনে করেন। মনে রাখবেন মহারাজ, কর্মকাণ্ডের আলোচনায় বোঝা যায়, বেদের একমাত্র যথার্থ বিধিনিষেধ, ব্রহ্মবিদ্যা তার অভিপ্রেত নয়। অবিদ্যার উপাসনা যারা করে, তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যারা শুধু বেদবিদ্যা নিয়ে আছে, তারা আরো বেশি অন্ধকারে প্রবেশ করে। বিদ্যাহীন এবং অবোধ জীব এই অন্ধকার লোক ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় পায় না। এই দেহে থেকেই আমরা কোনোরকমে ব্রহ্মকে জেনেছি। না জানলে জ্ঞানহীন হয়ে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যেতাম। তাঁকে জানলে অমর হওয়া যায়, নচেৎ নিদারুণ দুঃখ অনিবার্য। গুরুর উপদেশ অনুসারে কেউ যদি জ্যোতির্ময় ও ত্রিকালের ঈশ্বর আত্মাকে সাক্ষাত দর্শন করেন, সেই তিনি কখনো কারো নিন্দা করবেন না। করতে পারেন না। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন সম্রাট জনক?

—পারছি যাজ্ঞবল্ক্য। আপনি বলুন।

—দ্বৈতদর্শনেই নিন্দা করা যায়। কিন্তু সর্বাত্মদর্শী আর

কিভাবে নিন্দা করবেন ?

—শাশ্বত ও অনাদি ব্রহ্মকে -কেউ জেনেছেন, কিভাবে বুঝব ?

—তিনি যদি প্রাণের প্রাণ, নয়নের নয়ন শ্রবণের শ্রবণ এবং মনের মনকে জেনে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন। ব্রহ্মতে যিনি ভেদপ্রায় কিছু দেখেন, তিনি বারে বারে মৃত্যুর বশ্যতা স্বীকার করেন। অবিদ্যা থাকলে ভেদজ্ঞান দূর হয় না। একজন ধীমান ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মানুষ সেই আত্মার বিষয় জেনে তারপরে প্রজ্ঞা অবলম্বন করবেন। এই আত্মা সব কিছুর নিয়ামক, সকলের ঈশ্বর এবং সকলের অধিপতি। কোনো শুভকর্ম এঁকে মহৎ করে না। কোনো অশুভ কর্ম এঁকে হীন করে না। কেননা ইনি সর্বেশ্বর। ব্রাহ্মণেরা এঁকে জেনেই মুনি হন। পরিব্রাজকেরা এঁকে পাওয়ার ইচ্ছাতেই পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেন। 'নেতি-নেতি' যাঁকে বলা হয়েছে তিনিই আত্মা। আগেই বলেছি, ক্ষয় হন না বলে তিনি অক্ষয়। আসক্ত হন না বলে তিনি অসঙ্গ। ব্যথিত ও বিনষ্ট হন না বলে তিনি অবধ্য। পাপ-পুণ্য এঁকে আকুল করে না। ইনি এই দুটিকেই অতিক্রম করে। কোনো কৃত বা অকৃত কর্ম এঁকে সন্তাপিত করে না। ঋক্‌মন্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞের এটিই নিত্য মহিমা কারণ সেই মহিমা কখনো বাড়ে না কিংবা কমে না।

ওই মহিমাকে জানলে ব্রহ্মজ্ঞ কখনো পাপে লিপ্ত হন না। নিখিল বস্তুকে তখন তিনি আত্মা বলে দর্শন করেন। সমস্ত পাপকে অতিক্রম করেন বলে কোনো পাপ এঁকে স্পর্শ করে না। সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করেন বলে কোনো পাপ এঁকে সন্তপ্ত করে না, শুনুন সম্রাট, এটিই ব্রহ্মরূপ লোক। আপনি এঁকেই পেয়েছেন।

বিদেহ সম্রাট হন দারুণ কৃতার্থ হয়ে বললেন, আপনার এই উপদেশের জন্য আমি আপনাকে সমগ্র বিদেহ রাজ্য এবং নিজেকে দান করছি। আমাকে আপনি দান করে নিন।

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিলেন। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। এই দুজনের মধ্যে মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী ছিলেন নারীবুদ্ধিসম্পন্না।

যাজ্ঞবল্ক্য আশ্রম থেকে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন। মৈত্রেয়ীকে তিনি এই সংবাদ জানিয়ে বললেন, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চলেছি। এখন তুমি যদি সম্মতি দাও, তা হলে কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের অবসান ঘটিয়ে যাব। অর্থাৎ আমার যা কিছু বিত্ত সম্পদ তোমাদের দুজনকে ভাগ করে দিয়ে যাব।

মৈত্রেয়ী বললেন, আচ্ছা আপনি বলুন তো আপনার ওসব ধন সম্পদ নিয়ে আমি কি অমর হব? এমন কি এই ধনসম্পদ-পূর্ণ বিশালা পৃথিবী যদি আমার হয়, আমি কি তার সাহায্যে অমলর হতে পারব?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, না। তার সাহায্যেও তুমি

অমর হতে পারবে না।

—তাহলে ওসব দিয়ে আমি কি করব? বিত্তের দ্বারা তো অমরত্বের আশা নেই।

—তা অবশ্য নেই।

—তাহলে ওসব বিত্তবাসনার কথা আমাকে বলবেন না। অমরত্বের সাধন বলে আপনি যা মনে করেন, শুধু সেটুকুই আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য খুশি হয়ে বললেন, প্রিয়া, তুমি আগেও আমার অত্যন্ত আদরের ছিলে। আমার মন ভাল করা কথাই তুমি চিরকাল তুমি বলে এসেছ। আজও তাই বলছ। বেশ তো। তুমি যদি অমরত্বের সাধন পথই আমার কাছে জানতে চাও আমি তোমাকে তাই বলব। শুধু এ বিষয়ে একটি কথা মনে রেখো।

—বলুন।

—আমি যা বলব, প্রতিটি কথার অর্থ অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে।

—তাই হবে। মৈত্রেয়ী সশ্রদ্ধভাবে বললেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, পশুর জন্যই যে পশু মানুষের প্রিয় হয় তা নয়। মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনেই পশু মানুষের প্রিয় হয়। ঠিক সেইরকম বেদজ্ঞের নিজের প্রয়োজনে বেদ প্রিয় হয়। শোনো প্রিয়া, আত্মা যখন তোমার দৃষ্ট, শ্রুত, বিচারিত এবং বিজ্ঞাত হবে, তুমি তখন এই

সমস্ত জানতে পারবে।

—আমি বোঝার চেষ্টা করছি নাথ।

—আরো শোনো, যজ্ঞ, আহুতি, অন্ন, পান, ইহলোক, পরলোক, সমস্ত প্রাণী এই পরমাত্মার নিঃশ্বাসের মতো। আত্মার কোনো অন্তর নেই কোনো বাহির নেই। তাঁর পুরোটাই প্রজ্ঞানঘন। আত্মার খণ্ডিত ভাবটি এইসব ভূতবর্গ অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়, আবার এদের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়।

মৈত্রেয়ী একটু অবাক হয়ে বললেন, এইখানেই আপনি আমাকে মুসকিলে ফেললেন।

—কেন ?

—আমি আপনার বর্ণিত আত্মাকে একটুও বুঝতে পারছি না। বিভ্রান্তি লাগছে। নিজেকে মোহগ্রস্ত মনে হচ্ছে।

—কিন্তু প্রিয়া, মোহজনক কিছু তো আমি বলছি না। এই আত্মার তো কখনো উচ্ছেদ হয় না, তাঁর তো কোন বিকার নেই। জীবাত্মা কার্যকরণবিমুক্ত হয়ে নিজে পূর্ণ হয়ে থাকেন, নিজে বিজ্ঞান মন স্বরূপে অবস্থিত হন। সেটি তাঁর বিনাশ নয়। ব্রহ্মে যখন দ্বৈতপ্রায় হয়ে থাকে, তখন একে অন্যকে দ্যাখে, একে অন্যের গায়ের গন্ধ শোঁকে, একে অন্যের আস্বাদ নেয়, একে অন্যের সম্পর্কে চিন্তা করে একে অন্যকে স্পর্শ করে, একে অন্যকে জানে। কিন্তু যখন ওঁর সমস্তটাই আত্মা হয়ে গেল, তখন আর কি

দিয়ে কাকে দেখবে, কি দিয়ে কার গায়ের গন্ধ শুঁকবে, কি দিয়ে কার আস্বাদ নেবে, কি দিয়ে কাকে বলবে, কি দিয়ে কার কথা শুনবে, কি দিয়ে কাকে চিন্তা করবে, কি দিয়ে কাকে স্পর্শ করবে, কি দিয়ে কাকে জানবে! যাঁকে 'নেতি নেতি' বলা হয়েছে, তিনিই সেই আত্মা। গৃহীত হন না বলে ইনি অগ্রহণীয়, ক্ষয় নেই বলে ইনি অক্ষয়, আসক্তি নেই বলে ইনি অসঙ্গ, বিনাশ নেই বলে ইনি অবদ্ধ। বল তো প্রিয়ে, যিনি সকলের জ্ঞাতা, সেই বিজ্ঞাতাকে কিসের সাহায্যে জানবে? প্রিয়া মৈত্রেয়ী, এইভাবে আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম। এ ছাড়া অমরত্বের সাধন আর কিছুই নেই। এই পর্যন্ত বলে যাজ্ঞবল্ক্য পরিব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

পূর্ণ চিন্তা

তিনি পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ। পূর্ণ থেকে একমাত্র পূর্ণ ই উদ্‌গত হন। পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করলে পূর্ণ-ই অবশিষ্ট থাকেন। যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তিনি পূর্ণব্রহ্মারূপেই উদ্ভাসিত হন। তাঁর স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রেখেই পূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রহ্মের স্বরূপের কোনো বিচ্যুতি হয় না বলে অবিদ্যা ধ্বংস হলে পূর্ণস্বরূপের অবস্থান সম্ভব হয়।

দ দ দ

দেবতা, মানুষ এবং অসুর এঁরা সকলেই প্রজাপতির তিন ধরনের সন্তান।

এঁরা সকলেই প্রজাপতির কাছে ব্রহ্মচর্য বাস করে-ছিলেন।

ব্রহ্মচর্য শেষ করে দেবতারা বললেন, পিতা, আমাদের উপদেশ দিন।

—উপদেশ দেব ?

—হ্যাঁ।

—বেশ। তাহলে শোনো।

—বলুন।

—দ।

—দ ?

—হ্যাঁ, দ। বুঝলে ?

—বুঝেছি।

—কি বুঝলে ?

—আপনি বললেন, তোমরা দান্ত হও। অর্থাৎ আমরা যেন দমযুক্ত হই।

প্রজাপতি হেসে বললেন, ঠিক বুঝতে পেরেছ।

এরপর মানুষেরা তাঁকে অনুরোধ করলেন, পিতা, আমাদের উপদেশ দিন।

—উপদেশ দেব ?

—হ্যাঁ।

—বেশ। তাহলে শোনো।

—বলুন।

—দ।

—দ ?

—হ্যাঁ। দ। বুঝলে?

—বুঝেছি।

—কি বুঝলে?

—আপনি বললেন, তোমরা দান কর।

প্রজাপতি হেসে বললেন, ঠিক বুঝতে পেরেছ।

এরপর অসুরেরা তাঁকে ধরে বসলেন, পিতা, আমাদের উপদেশ দিন।

—উপদেশ দেব?

—হ্যাঁ।

—বেশ! তাহলে শোনো।

—বলুন।

—দ।

—দ?

—হ্যাঁ। দ। বুঝলে?

—বুঝেছি।

—কি বুঝলে?

—আপনি বললেন, তোমরা দয়া কর।

প্রজাপতি হেসে বললেন, ঠিক বুঝতে পেরেছ।

মেঘের রূপ ধারণ করে দৈববাণী আজো প্রজাপতির ওই উপদেশের আবৃত্তি করে "দ। দ। দ।"—অর্থাৎ দান্ত হও, দান কর, দয়া কর।

সুতরাং সকলেরই দম, দান এবং দয়া এই তিনটি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

আসলে দেবতা, মানুষ এবং অসুর এই তিনটি শব্দকে সাধারণ অর্থে না গ্রহণ না করে তিন প্রকৃতির মানুষের পরিচয় হিসেবেই নেওয়া উচিত।
তিন শ্রেণীর মানুষই ব্রহ্মচর্য পালনের সময় নিজেদের দোষ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে, একই 'দ' অক্ষর প্রজাপতি উচ্চারণ করলেও নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী তিন ধরনের অর্থ করলেন।
এঁর থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রজাপতির সন্তানদের মতো সমস্ত সাধকেরই এই তিনটি উপদেশ একত্রে গ্রহণ করা উচিত।

হৃ দ য়

হৃদয়ই এই প্রজাপতি।
হৃদয় ব্রহ্ম। হৃদয় সমস্ত।
হৃদয় নামটিই ত্র্যক্ষর।
হৃ প্রথম অক্ষর। যিনি এই অক্ষরকে জানেন, আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁর জন্য উপহার নিয়ে আসেন।

দ একটি অক্ষর। যিনি এই অক্ষরকে জানেন, আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁকে নিজেদের সমস্ত কিছু দান করেন।

য় একটি অক্ষর। যিনি এই অক্ষরকে জানেন, তিনি স্বর্গে যান।

সাকল্যব্রাহ্মণে রয়েছে, হৃদয়ই সর্বভূতের অধিষ্ঠান এবং সর্বভূতাত্মক প্রজাপতি। তাই একমাত্র উপাস্য হৃদয়ব্রহ্ম। হৃদয়ব্রহ্মের উপাসনায় যে ফল, এঁর নামাক্ষরের উপাসনার ঠিক সেই ফল পাওয়া যায়।

সুতরাং মনে রাখা উচিত, যাঁর নামাক্ষরের উপাসনায় এত সুন্দর ফল পাওয়া যায়, সেই হৃদয়ব্রহ্ম অবশ্যই উপাস্য।

স ৎ য

সত্যই ব্রহ্ম।

আগে এই জগৎ জল হিসেবেই শুধু বিদ্যমান ছিল। সেই জল সত্যকে সৃজন করল। এই সত্য হিরণ্যগর্ভ।

হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি করলেন বিরাট্‌কে।

বিরাট্‌ সৃষ্টি করলেন দেবতাদের।

দেবতারা সত্যেরই উপাসনা করেন।

প্রথমে সৃষ্টি বলে সত্য প্রথমজ।

তিনি ব্রহ্ম বলে মহৎ।

তিনি মহৎ। কেননা তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। দেবতারা সমস্ত বাদ দিয়ে সত্যের উপাসনা করেন। সত্যের জন্যে তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করেন। তাই তাঁরা দেবতা। তাই সত্য পূজনীয়।

'সত্য' এই নামটিতে তিনটি অক্ষর রয়েছে।

একটি অক্ষর "স"।

একটি অক্ষর "ৎ"।

একটি অক্ষর "য"।

প্রথম ও শেষ অক্ষর দুটোই সত্য। মাঝখানের অক্ষরটি মিথ্যা।

এই মিথ্যা দুইদিকে সত্যের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে সত্য বললে বা সত্যপূর্ণ হয়।

এইরকম যিনি জানেন, মিথ্যা তাঁর কোনো ক্ষতি করে না।

সত্যব্রহ্মের একটি উপাসনা

উপাসনা করা উচিত বাগ্‌রূপিণী ধেনুকে। তাঁর চারটি গুণ। সেই চারটি গুণের নাম স্বাহাকার, বষট্‌কার, হন্তকার এবং স্বধাকার।

তাঁর স্বাহাকার এবং বষট্‌কার—এই দুটি গুণ অবলম্বন করে দেবতারা জীবনধারণ করেন।

তাঁর হন্তকার গুণ অবলম্বন করে মানুষেরা জীবনধারণ করেন।

তাঁর স্বধাকার গুণ অবলম্বন করে পিতৃগণ জীবনধারণ করেন।

সেই গাভীর বৃষের নাম প্রাণ।

সেই গাভীর বাছুরের নাম মন।

গাভীর চারটি স্তন থেকে দুধ বেরিয়ে বাছুরদের প্রাণরক্ষা করে। ঠিক সেইরকম এই বাগ্‌ধেনুর চারটি স্তন থেকে

অন্ন ক্ষরিত হয়। 'স্বাহা' ও 'বষট্' উচ্চারণ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। আর 'স্বধা, উচ্চারণ করে পিতৃদের পিণ্ড দেওয়া হয়। 'হন্ত' বলে মানুষকে অন্ন দেওয়া হয়।

বৃষের সাহায্যে গাভী প্রসূত হয়। ঠিক সেইরকম প্রাণের সাহায্যে বাক্ কিংবা চারটি বেদ উচ্চারিত হয়, প্রাণের সাহায্য ছাড়া এসব উচ্চারণ করা যায় না।

গাভীর দুধের হেতু তার বাছুর। ঠিক সেইরকম মনের দ্বারা আলোচিত বিষয়ে বাক্ প্রবৃত্ত হয়। এবং বেদমন্ত্রের প্রয়োগ হয়।

এই উপাসনার ফলে বাগ্‌ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়।

বি, রম্

প্রাতৃদ শুনেছিলেন, কেউ কেউ বলেন, অন্নই ব্রহ্ম। কিন্তু এ তো ঠিক কথা না। কারণ প্রাণের অভাবে অন্ন পচে যায়, আবার কেউ কেউ বলেন, প্রাণ ব্রহ্ম। কিন্তু এটাও তো ঠিক কথা নয়। কেননা অন্নের অভাবে প্রাণ শুকিয়ে যায়। প্রাতৃদের মনে হলো, এই দুইজন একীভূত হয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। এরকম ভেবে তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, যিনি এ হেন জ্ঞান অর্জন করেছেন, আমি তাঁর কি ভালো করতে পারি,

কি মন্দ করতে পারি ?

বাবা তাঁর দু-হাত ধরে বললেন, না প্রাতৃদ, তোমার চিন্তাতেই ভুল রয়ে গেছে। এঁদের সঙ্গে একীভূত হয়ে কে আবার ব্রহ্মত্ব লাভ করে। তুমি বরং আমার কথা শোনো।

প্রাতৃদ বললেন, বলুন ?

—ইনি অর্থাৎ অন্ন "বি"। কেননা সমস্ত প্রাণী অন্নে প্রবেশ করে। অন্নেই সকলে আশ্রিত। আবার ইনি "রম্"। অর্থাৎ প্রাণই রম্। কেননা প্রাণ থাকলেই সমস্ত প্রাণী রতি অর্থাৎ আনন্দ লাভ করে। এইরকম যিনি জানেন, নিখিল প্রাণী তাঁকে আশ্রয় করে থাকে।

কিশোর উপযোগী ভিন্ন-স্বাদের প্রকাশিত কয়েকটি বই

জাতকের গল্প	দেবব্রত মল্লিক
বেতাল পঞ্চবিংশতি	সলিল লাহিড়ী
কথাসরিৎ সাগরের গল্প	পরিতোষ নন্দী
পঞ্চতন্ত্রের গল্প	গীতা ঘোষ
পারস্যের গল্পগাথা	অর্ধেন্দু চক্রবর্তী
গল্পের দেশ ইরাক	সলিল লাহিড়ী
আরব্য রজনীর গল্প	ভীষ্মদেব
বাগদাদের শাহী গল্প	শচীন দাশ
তুরস্কের গল্পগাথা	রবীন্দ্র ঘোষ দস্তিদার